ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

উৎসর্গ

ঠাকুরদাদা নবীনচন্দ্র সেন
ও ঠাকুরমা মুক্তকেশী দেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

চিত্র তালিকা

"তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে
সাধ্য আছে কা'র!
সত্যের বন্ধন পরো, সে বন্ধন প্রেম মন্ত্র বলে
করো অলঙ্কার।
জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে বাঁধো
দিন রাত্রে সুখে দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার।।"

অবতরণিকা

কোন মানুষের, বিশেষ করে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে, তাঁর কর্মধারা জানতে হলে, বুঝতে হলে সবচেয়ে আগে জানতে হবে তাঁর পরিবেশকে। এই পরিবেশের দুটি দিক। একটি হলো তাঁর ব্যক্তিগত, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবেশ যা আছে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়কে কেন্দ্র করে—তাঁর পিতামাতা, স্বজন বান্ধব, তাঁর স্কুল কলেজ ও তাঁর চারপাশের পরিবেশকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি নিজস্ব জগত যা তাঁর অজান্তেই তাঁকে প্রভাবিত করে। এই পরিবেশ থেকেই গড়ে ওঠে তাঁর নিজের চিন্তা ও অনুভূতির জগত।

আর একদিকে থাকে তাঁর যুগ পরিবেশ—অর্থাৎ সেই কালের নানা জিজ্ঞাসা, নানা আন্দোলন, সংঘর্ষ এবং সাথে সাথে বুদ্ধি বিচারগত নানা চিন্তাভাবনা—স্থান ও কালের এই দুই আধারে তাঁর হৃদয় ও মন ক্রমশ পরিণত হয়।

স্বল্প পরিসরে, স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরবর্তী জীবনে সংসারী এবং সমাজসেবী প্রফুল্লকুমার সেনের ব্যক্তি জীবন, সংগ্রামী জীবন, কর্মজীবন ও সংসার জীবনের পরিচয় তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রয়াস। একদিকে যেমন পারিবারিক ও শিক্ষাগত তথা বিদ্যালয়ের প্রভাব কিভাবে তাঁর জীবনের মূল ভিত্তিকে গড়ে তুলেছিল, অন্যদিকে যুগের প্রভাব, কালের প্রভাবে দেশমাতৃকার কাজে কিভাবে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন—এই জীবনালেখ্যে তাই ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু নথিপত্রের প্রতিলিপি পরিবেশিত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বংশ পরিচয়

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্লকুমার সেনের জন্ম রবিবার, ইংরাজী ১৯০৬ সালের ৪ঠা মার্চ এবং বাংলা ২০শে ফাল্গুন ১৩১২ সালে। জন্মস্থান—অবিভক্ত বাংলার [বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চোদ্দগ্রাম থানার ঘাসিগ্রাম] ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা মহকুমার ঘাসিগ্রাম সেনবংশে। পিতা—নবীনচন্দ্র সেন। মাতা—মুক্তকেশী দেবী। মাতৃহারা প্রফুল্ল সেনের বিমাতা সুরবালা দেবী।

বংশ পরিচয় ঃ

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" (খণ্ড ষষ্ঠ, পৃঃ ২৯) গ্রন্থতে সেনবংশের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ কারিকায় এদেশের কায়স্থ সমাজে ৯৯টি পদ্ধতি ও পদবী নির্দিষ্ট হয়েছে—যার মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, সেন ইত্যাদি দ্বাদশটি সিদ্ধ বলে কুলগ্রন্থে প্রসিদ্ধ। উক্ত ৯৯টি পদবীর মধ্যে আবার কোন কোন পদবীর একাধিক গোত্র দেখা যায়। সেন বংশের গোত্র অর্থাৎ প্রফুল্লকুমারের পিতৃকুলের গোত্র বাসুকি পরাশর। প্রবর—অক্ষোভ্য—অনন্ত—বাসুকি প্রবরাঃ।

কুলপঞ্জী ঃ

প্রফুল্লকুমারের স্বহস্তে লিখিত বংশ তালিকা বা কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়—"কুমিল্লা সাবডিভিশনের ঘাসিগ্রাম সেনবাড়ী"—

গদাধর সেন
[জয়া দেবী]
রামবল্লভ সেন
রামগতি সেন
[চন্দ্রকলা দেবী]
মনিরাম সেন
মদনমোহন সেন
[পদ্মাবতী দেবী]
গোবিন্দরাম সেন
কৃষ্ণচন্দ্র (বগলা)
[শশিমুখী দেবী]
গোবিন্দ চন্দ্র
[চন্দ্রতারা দেবী]
নবীনচন্দ্র
[মুক্তকেশী দেবী
ও সুরবালা দেবী
ভারতচন্দ্র
বনমালী, যতীন্দ্রমোহন, দুর্গামোহন
প্রফুল্লকুমার
সুহাসিনী
পিতাঃ অনন্ত
[ফুলপিয়ারা]
পূরবী
পুষ্পিতা
সুকান্ত (জামাতা)
পারমিতা
সুমিতাভ (জামাতা)
সম্প্রীতি (নাতনী)
সুপ্রতীক (নাতি)
প্রফুল্লকুমারের মাতুলবংশ
গ্রাম—ঘাসিগ্রাম
রামলোচন চৌধুরী
তিলোত্তমা দেবী
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
মনসা দেবী
গগনচন্দ্র চৌধুরী (দাদু)
শ্যামাসুন্দরী (মঞ্জুরী) ও সুখদাসুন্দরী

গগনচন্দ্র চৌধুরী (দাদু)
শ্যামাসুন্দরী (মঞ্জুরী) ও সুখদাসুন্দরী
(মাতুল) প্রসন্ন চৌধুরী
কুসুমকুমারী দেবী
মুক্তকেশী (মাতা)
গনেশচন্দ্র
কুঞ্জকামিনী
তীর্থবাসিনী
নৈদাবাসিনী
ননী
মাখন
মনোরঞ্জন
মামাতো ভ্রাতা
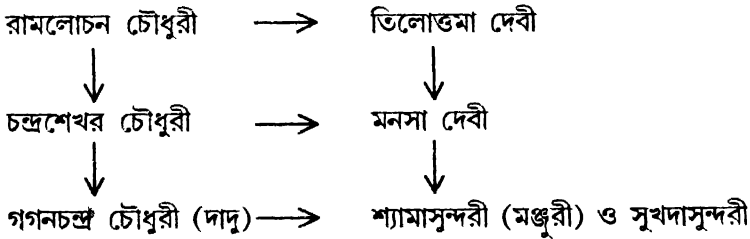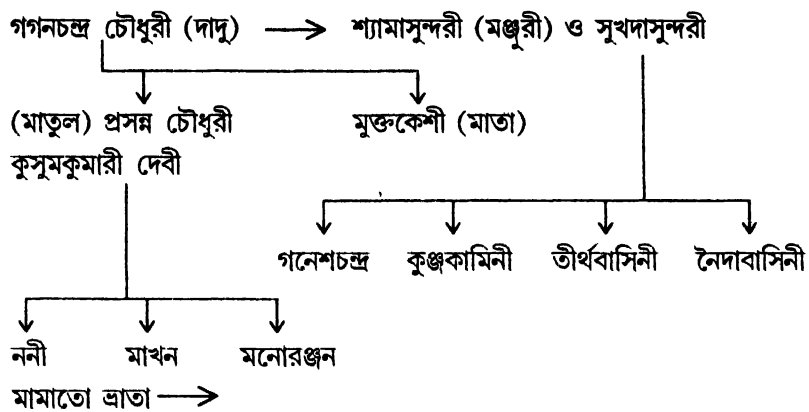
শিশুকে পিতার স্নেহে অতিযত্নে মানুষ করে তোলার দিকে দৃষ্টি দেন। সে আমলের একান্নবর্তী পরিবারে জেঠাইমা বিধবা শশিমুখী দেবী (নবীনচন্দ্রের জেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র সেনের বিধবাপত্নী) তাঁর অপার স্নেহে দুজনকে বড় করে তোলেন। প্রফুল্লকুমার ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন। তাঁর কাছে শোনা যায় যে ছোটবেলায় তিনি এত দুরন্ত ছিলেন যে রাগ হয়ে গেলেই সবকিছু ভেঙে তছনছ করে ফেলতেন। মাতা মুক্তকেশী দেবী জীবনের স্বল্প পরিসরে ছেলেকে মানুষ করার লক্ষ্যে খুব কড়া শাসনে রাখতেন। জ্যাঠাইমা শশিমুখী দেবী নানা কৌশলে ছেলেকে শান্ত করে মায়ের শাসনের হাত থেকে রক্ষা করতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের অভাব তিনি মাতৃহারা সন্তানদের কোনদিন বুঝতে দেননি। নবীনচন্দ্র সেন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করেন বেশ কিছুকাল পরে। প্রফুল্লকুমারের বয়স তখন প্রায় সতেরো। বিমাতা সুরবালা দেবীও তাঁর এই দুই সন্তানকে খুবই ভালবাসতেন। তবে তিনিও দীর্ঘজীবন পাননি এবং নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র সাত বছরের। প্রফুল্লকুমারের কাছে শোনা যে তিনি ল্যান্টার্ন লেকচার দিয়ে টাকা পেয়ে প্রথম রোজগারের টাকায় মা'কে (বিমাতাকে) কাপড় কিনে পাঠিয়েছিলেন। তবে সেইসময় প্রফুল্লকুমার স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে গৃহ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। শূন্যগৃহে মন কেমন করলেই সুরবালা দেবী শ্বশুরালয় থেকে কন্যা সুহাসিনী দেবীকে আনিয়ে নিজের কাছে রাখতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয় জীবন ও অসহযোগ আন্দোলন

বিদ্যালয় জীবন

গ্রামের কাছে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের পাশে পূর্বদিকে মিঞাবাজার মাইনর স্কুলে প্রফুল্লকুমারের বিদ্যারম্ভ হয়। হেডপণ্ডিত ছিলেন তারকবাবু, যিনি তারকমাস্টার নামে পরিচিত। তিনি কঠোর শাসনে ছাত্রদের রাখতেন। প্রফুল্লকুমারের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। মাইনর স্কুলে প্রফুল্লকুমারের সহপাঠী ছিলেন প্রকাশ, শ্রীশ, অটল প্রমুখ। প্রফুল্লকুমার অল্পবয়সেই তাঁর মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রফুল্লকুমার গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুলে ক্লাস সিক্সে বৃত্তি পেয়েছিলেন।

খেলাধুলাতেও প্রফুল্লকুমার ভালো ছিলেন। হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা প্রভৃতি খেলায় পারদর্শিতা এবং শারীরিক পটুতার জন্য গ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ইন্টারস্কুল প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লকুমার স্কুলের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। সুয়াগঞ্জ স্কুলের ছাত্ররাও ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরাই বিজয়ী হয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় সুয়াগঞ্জ স্কুলের ছাত্র যোগেশ চক্রবর্তী (পরে ত্রিপুরার কারামন্ত্রী হয়েছিলেন) অংশগ্রহণ করেছিলেন। যোগেশের সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট ছিল। যোগেশের বাড়ী ছিল ফুলতলী। উভয়ে উভয়ের বাড়ীতে বন্ধুত্বের সুবাদে যাতায়াত করতেন।

যোগেশের উৎসাহে প্রফুল্লকুমার কুমিল্লার শ্রী মহেশ ভট্টাচার্য স্থাপিত নামী স্কুল ঈশ্বর পাঠশালায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রফুল্লকুমারের 'আত্মকথা' থেকে জানা যায় যে পূর্বে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র প্রফুল্লকুমার ঈশ্বর পাঠশালায় এসে প্রথম দুই এক বছর ক্লাসে ভালো ফল করতে পারেন নি। কারণ ঈশ্বর পাঠশালা ছিল কুমিল্লার সেরা ছাত্র সমৃদ্ধ স্কুল। ধীরে ধীরে যখন তিনি স্কুলে ধাতস্থ হয়ে উঠছেন তখন দেশজুড়ে নন্-কোঅপারেশন মুভমেন্ট বা অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। প্রফুল্লকুমারও ঐ আন্দোলনের ঢেউ-এ যোগ দেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

লর্ড কার্জনের ভারতবর্ষের ভাইসরয় হয়ে আসা ভারত ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহুদিন পরাধীন থাকার পরও কোন কোন জাতির মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে না যতক্ষণ না কেউ তীব্র কশাঘাতে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়ে দেয়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।[৩] ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে মালদহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও রাজসাহীকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। এই নতুন প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করবেন একজন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর। ঢাকা হবে এই নতুন প্রদেশের রাজধানী। অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে একত্র করে অন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হবে। কলিকাতা হবে তার রাজধানী। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার সমর্থনে লর্ড কার্জন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে একজন গভর্নরের হাতে বাংলার মতো এক বিশাল প্রদেশের শাসনভার রাখা মোটেই সমীচীন নয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাগের অভিসন্ধি ছিল ভিন্ন। সেই সময় বাংলা ছিল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পীঠস্থান। তাই লর্ড কার্জন চেয়েছিলেন বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি করা।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাভাগের দিন স্থির করা হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

সুতরাং ১৯০৫ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কোলাহলে বাঙালীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে বাংলার জনগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। দিকে দিকে ধ্বনি ওঠে—"বঙ্গভঙ্গ চলবে না, হতে দেবো না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ মানি না। মানবো না।" বাঙালীর লেখায়, বক্তৃতায়, লাঠিতে, অসিতে, রিভলবারে, পিস্তলে ও বোমায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে ওঠে দিকে দিকে। 'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী' এবং 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা হয়। ইংরাজ পরিচালিত 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটসম্যান' এবং 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতেও

বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করা হয়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন এর প্রতিবাদে সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুসারে সেইদিন বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধনও পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে রাখী বন্ধনের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলার নরনারী খালিপায়ে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে গঙ্গায় স্নান করে হিন্দু-মুসলমান বাঙালি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অখণ্ডতার প্রতীক হিসাবে একে অপরের হাতে রাখী বাঁধে। বাংলার কালান্তক আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে চতুর্দিকে। বুদ্ধিমান, বেপরোয়া বাঙালী সেই বিপ্লবাগ্নি ছড়িয়ে দেয় দেশময়—মারাঠা, পাঞ্জাবে তথা সমগ্র ভারতে তড়িৎগতিতে। এই বঙ্গভঙ্গই এদেশে প্রথম বিপ্লবী গণজাগরণ আনে। সমগ্র ভারত সে অমর আহ্বানে প্রাণবন্ত সাড়া দেয় নিষ্ঠা ভরে।

বঙ্গভঙ্গ তথা বয়কট আন্দোলন শেষে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। বয়কট আন্দোলনে বিদেশি পণ্য বর্জন, বিদেশি বিদ্যালয় বর্জন, বিদেশি শাসন বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যসম্ভারের ব্যবহার, স্বদেশী শিক্ষার প্রসার ও স্বদেশী শিল্পের প্রসার ঘটে। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় শুরু হলেও তা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির শিল্প ও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। স্বদেশী তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়া জাত দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে ওঠে। পশ্চিম ভারতে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন জোরদার করে তোলেন লোকমান্য তিলক। স্যার জামসেদজী টাটা জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেন। বাংলায় প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা, ডাঃ নীলরতন সরকার জাতীয় সাবান কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নতুন উৎসাহ দেখা দেয়।

স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও স্বাদেশিকতার জোয়ার আনে। জাতীয় শিক্ষার মূলকথা হল জাতীয় স্বার্থে ও দেশ পরিচালনায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, কারিগরী শিক্ষা সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক করা, দেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জাতীয় আন্দোলনে আশঙ্কিত হয়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করে যে জনমত উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ বজায় রাখা সমীচীন হবে না, অবশেষে ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করার কথা ঘোষণা করেন। দুই বাংলা আবার এক হয়।[৪]

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দেন এবং তা ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ জনগন যদি ভারতীয়দের প্রতি ন্যায় বিচার না করে তাহলে প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা। এইভাবে গান্ধীজী হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করা। এই আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল একাধারে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক বা গঠনমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশী বিশেষ করে চরকা ও খদ্দরের ব্যাপক প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ়করণ ও তিলকের স্মৃতি তহবিলের জন্য এককোটি টাকা সংগ্রহ। অপরদিকে নেতিবাচক বা বিনাশমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সরকারি খেতাব, আদালত, সরকারি শিক্ষায়তন বর্জন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন বর্জন, মদ্যপান নিবারণ, ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জন। এই সময়েই চরকা ও খাদি জাতীয়তাবাদের নতুন প্রতীক হয়ে ওঠে।[৫]

১৯২১ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। গান্ধীজীর আহ্বানে আইনজীবিরা আদালত বর্জন করেন, হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী সরকারি স্কুল কলেজ ছেড়ে জাতীয় শিক্ষায়তনে যোগ দেয়, বিলাতী পণ্য সামগ্রী বর্জন ও পুড়িয়ে ফেলা হয়। শ্রমিকরা কলকারখানা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেন। সর্বত্র স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের হিড়িক পড়ে যায়। মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বিখ্যাত আইনজীবিরা আইন ব্যবসা বর্জন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পদ ত্যাগ করেন। কাশী, গুজরাট, বারাণসী বিদ্যাপীঠ, বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আন্দোলন চালাতে অর্থের প্রয়োজনে তিলক স্বরাজ্য তহবিল গঠন করা হয়। ভারতীয় নারীরা মুক্তহস্তে অলঙ্কার, সোনাদানা এই তহবিলে দান করেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারও মারমুখী হয়ে ওঠে। নিরস্ত্র জনগণের উপর লাঠি ও গুলি চালান হয়। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আটক করা হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন গোরক্ষপুরে চৌরিচৌরায় উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে ২২জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠায় মর্মাহত হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।[৬]

তৃতীয় অধ্যায়

অনুশীলন সমিতিতে যোগদান ও দীক্ষাগ্রহণ

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ কুমিল্লা শহরকেও প্রকম্পিত করেছিল। প্রফুল্লকুমারের কাছে শোনা—"নগরে নগরে জ্বালরে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।" এবং "বিদেশী শিক্ষায় করি পদাঘাত, বাংলার দামাল ছেলে এগিয়ে যাও" প্রভৃতি গান এবং স্লোগান দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদের ঢেউ গড়ে তোলে এবং প্রফুল্লকুমারও ১৯২১-২২ সালে স্কুল ছেড়ে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রফুল্লকুমারের যোগদানের কারণ ছিল ঈশ্বর পাঠশালা। ঐ স্কুলের শিক্ষক অনুশীলন সমিতির কর্মী বীরেন সেন প্রফুল্লকুমারকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বীরেনবাবুর খুড়িমা বিরজাসুন্দরী দেবী এবং বীরেনবাবুর স্ত্রী উভয়েই প্রফুল্লকে স্নেহ করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বীরেনবাবুর খুড়তুতো বোন প্রমীলাকে (বিরজাসুন্দরী দেবীর কন্যা) বাংলার স্বনামধন্য কবি নজরুল বিবাহ করেছিলেন।

ঈশ্বর পাঠশালার ভালো ভালো ছাত্ররা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তাদের সাহচর্য ও সংসর্গ প্রফুল্লকুমারকে মুগ্ধ করতো। তদুপরি প্রফুল্লকুমারের পারিবারিক পরিমণ্ডলও স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। প্রফুল্লকুম'রের পিতা নবীনচন্দ্রের সম্পর্কিত কাকা চন্দ্রকুমার সেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অমান্য করার অপরাধে সিভিল জেলে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। প্রফুল্লকুমারের সম্পর্কিত কাকা শ্রীশচন্দ্র সেনও কুমিল্লা হাই স্কুলে পড়বার সময় অনুশীলনের কর্মী ছিলেন।

প্রফুল্লকুমার সেনের পিসতুতো দাদারা (কাশীনগর মজুমদার বাড়ী) ব্রিটিশ পুলিশের রাজবন্দী ছিলেন এবং অনুশীলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পিসতুতো দাদা কালীপ্রসন্ন মজুমদার, বগলাপ্রসন্ন মজুমদার প্রমুখ প্রফুল্লকুমারকে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন গ্রামে স্বদেশী সভায় নিয়ে যেতেন। সম্পর্কিত ভাইপো তারিনী মজুমদার ঢাকা কলতাবাজার সম্মুখ সমরে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে মারা যান। তাঁর সঙ্গী নলিনী বাগচী গুরুতর

আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। নলিনী বাগচীর সেই বিখ্যাত উক্তি চিরস্মরণীয় "Don't disturb me, let me die peacefully"। [তারিণী মজুমদারের লুপ্তপ্রায় তৈলচিত্র মহাজাতি সদন এবং অনুশীলন ভবনে প্রফুল্লকুমারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়।] পিসতুতো বড়দি শিবসুন্দরী ছিলেন বালবিধবা এবং বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়।

স্বদেশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ পরিবার হিসেবে পরিচিতির কারণেই সেন বাড়ীতে মাঝে মাঝে তল্লাসী চলত। প্রফুল্লকুমারের মুখে শোনা যে সেন বাড়ীতে পুলিশি অনুসন্ধান কালে বাড়ীর মহিলাদের হেফাজতে রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র থাকত। তারা পরনের কাপড়ের মধ্যে, পেটের কাপড়ের সাথে ঐ সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র বেঁধে রাখতেন। ছোট ছোট ছেলেরা মায়ের কোলে থাকত। পুলিশ ছেলে কোলে অবস্থায় মহিলাদের তল্লাসী থেকে বাদ দিত। একবার প্রফুল্লকুমার তখন খুবই ছোট, মায়ের কোলে। রিভলবার শক্ত ঠেকায় মাকে জিজ্ঞেস করেন "মা কি?" মা বলেন, "খোকা, চুপ।" এই স্মৃতি তাঁর মনে চিরদিন অটুট ছিল।[৭]

এই সময়ে চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ, কালীমোহন ঘোষ (প্রয়াত শান্তিদেব ও সাগরময় ঘোষের পিতা) ঘাসিগ্রামে আসেন এবং গ্রামের গ্রন্থাগারে তাঁদের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। তাঁদের গ্রামে আসার উদ্দেশ্য ছিল অনুশীলনের সংগঠনকে জোরদার করা। তাঁরা কয়েকদিন গ্রামে অবস্থান করেন। এরপরে প্রফুল্লকুমার, সুশীল, স্বদেশ (স্বর্গত তারিণী মজুমদারের ছোট ভাই) সংগঠনের কাজে আশেপাশের গ্রামে যাতায়াত করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি অনুশীলনের কাজে বা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হত। গ্রাম্য জেলাগুলিতে সেবা সঙ্ঘের কাজেও অনুশীলনের কর্মীরা যোগ দিতেন, ফলে অনুশীলনের শাখা কেন্দ্র আশেপাশের গ্রামেও স্থাপিত হয়।

ঘটনাক্রমে সেই বছরের পূজার ছুটিতে প্রফুল্লকুমারের পিসতুতো দুই ভগিনীপতি শশীকুমার বসু (পিসতুতো মেজদি জানকী দেবীর স্বামী) ও সীতানাথ নারায়ণ চৌধুরী (যিনি নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্ববংশে নিহত হন) উভয়ে প্রফুল্লকুমারদের কুমিল্লার বাড়ীতে আসেন। তাঁরা প্রফুল্লকুমারের পিতার কাছে ছেলের কার্যকলাপ, পড়াশুনা প্রভৃতি বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পিতা নবীনচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া এবং অবাধ্যতার কথা তাঁদের জানান। দুঃখিত পিতার সকাতর উক্তি এখানে উল্লেখ্য, —"এখন একে সবাই বখাটে ছেলে বলে জানে। মাতৃহারা ছেলেকে আমি মানুষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়েছে।" ভগিনীপতি শশীকুমার বসু প্রফুল্লকুমারকে অনেক বোঝালেন যে শিক্ষা না থাকলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। দেশের বড় বড় নেতারা প্রত্যেকেই

যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিজে একজন নামকরা ব্যারিস্টার।

পরবর্তীকালে শশীকুমার বাবু আবার এলেন কুমিল্লায় এবং এবার তিনি প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে করেই নোয়াখালী দত্তপাড়ায় নিয়ে যান। তিনি প্রফুল্লকুমারকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে রাখলেন এবং দত্তপাড়া স্কুলে ভর্তি করে দেন। দত্তপাড়া স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তখনকার সুপরিচিত শিবপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরী। ঐ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (শিবপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরীর ছোট ভাই), শশীকুমার বসু (প্রফুল্ল কুমারের ভগিনীপতি) এবং অনন্তকুমার বসু (যিনি পরবর্তী জীবনে প্রফুল্ল কুমারের শ্বশুর হন)। প্রফুল্লকুমার অল্পদিনের মধ্যেই এদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী কংগ্রেসের একজন বড় কর্মী ছিলেন। তিনি প্রফুল্লকুমারকে সেখানকার কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত করলেন। ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী গ্রামেও সংগঠন বৃদ্ধি পায়।

১৯২৮ সালে প্রফুল্লকুমার দত্তপাড়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষা দেবার জন্য মনোনীত হন। নোয়াখালী শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র নির্দিষ্ট হয়।[৮] নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ উকিল যশোদা ঘোষের বাড়ীতে পরীক্ষা চলাকালীন প্রফুল্লকুমারের থাকার ব্যবস্থা হয়। এর ব্যবস্থাপক ছিলেন দত্তপাড়া চৌধুরী বাড়ীর ছোটকর্তা রাজ ইন্দ্রনারায়ণ সুর চৌধুরী মহাশয়। তাঁর পত্নী ছোটরানীমা প্রফুল্লকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। এই অপার স্নেহের পেছনে ছিল এক হৃদয়বিদারক কাহিনী। প্রফুল্লকুমারের কাছ থেকে জানা যায় ছোট রানীমার প্রথম পুত্র দেখতে অবিকল প্রফুল্লকুমারের মত ছিলেন। একবার প্রফুল্লকুমার কংগ্রেসের কাজে চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে চৌধুরী বাড়ীতে যান এবং ছোটরানীমার নজরে পড়েন। প্রফুল্লকুমারকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তাঁর সুন্দর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে রানীমা তাঁকে কৌশলে বাড়ীর অন্দরমহলে আনান এবং তাঁর কাছে 'মা' ডাক শুনতে চান। তদবধি প্রফুল্লকুমার তাঁকে 'মা' বলেই সম্বোধন করতেন। এই 'মা'কে লেখা চিঠি পাওয়া যায় প্রফুল্লকুমারের জেলে বসে লেখা খাতা থেকে। চিঠিটির তারিখ ২০শে জৈষ্ঠ্য '৪৮ বাং ৩.৬.৪১ মঙ্গলবার।

Matriculation ১৯২৮ পরীক্ষায় প্রফুল্লকুমার প্রথমবিভাগে বাংলায় লেটার নিয়ে চিটাগাং ডিভিশনে প্রথম হন। এই পরীক্ষার ফল Calcutta Gazette-এ প্রকাশিত হয়।[৯] এরপর প্রফুল্লকুমার কুমিল্লার Victoria কলেজে আর্টসে ভর্তি হন। প্রফুল্লকুমারের ইচ্ছা ছিল সায়েন্স নিয়ে পড়ার। কিন্তু তখন বেশি কলেজে সায়েন্স পড়ার সুবিধা ছিল না। অতঃপর তিনি কুমিল্লায় ভর্তি হওয়া ঠিক করেন। কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আর্টস নিয়েই ভর্তি হতে হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন বসু। তাঁর ছোটভাই সুধীন্দ্রনাথ বসু অনুশীলনেরই সভ্য

ছিলেন।

কলেজের নতুন পরিবেশে ক্লাস কম থাকায় প্রফুল্লকুমারের সংগঠনের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়।[১০] প্রফুল্লকুমার চিরদিনই অনুশীলনের সংগঠক হিসাবে কাজ করেছেন। বিপ্লবী দলে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার বীজ বপন ঘটেছিল প্রফুল্লকুমারের স্কুল জীবনে। তার প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে যা নীচে যুগকাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সে এক উন্মাদনার কাল যখন শত শত তরুণ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে আত্মবিলদানে প্রস্তুত।

যুগকাল ঃ

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ—
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"।

কবির জীবদ্দশাতেই, তাঁর স্বদেশে এই কথাটি সার্থক ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। "লক্ষ পরাণে—শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ"—সে সত্য যে কেমন ধারার, বিপ্লববাদীদের জীবন মরণ খেলায় দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। [বাংলায় বিপ্লববাদ পৃ. ১-৩]

এমন আপনভোলা, হিসাব নিকাশে অবুঝ অনভিজ্ঞ মানুষজন—যাঁরা দেশকে পেয়ে নিজেদের আপনজনকে ভুলেছিলেন, দেশের হিসেব নিকেশ বুঝতে গিয়ে আর সব হিসেব নিকেশ ছেড়ে দিয়েছিলেন, রেখে ঢেকে কিছু করা যাঁদের হয়ে ওঠেনি—সেই অজ্ঞাত অথচ কর্মবহুল জীবনগুলির একটুখানি ছায়াচিত্রও কেউ রাখেননি। তাঁদের খবর তাঁদের নিজেদের কাছ থেকে না পাওয়া গেলে আর কোথাও পাওয়া যায় না, ভাই বন্ধুরাও এঁদের জীবনের গতির সঙ্গে অপরিচিত। দেশবাসী দূর থেকে এঁদের শুধু লক্ষ্য করেছেন কিন্তু পরিচয় লাভে সাহসী হননি। আপনজন এঁদের ছেড়েছিলেন তবুও সেই আপনজনের থেকে দূরে, দূর থেকে আরও দূরে তাঁদেরই মুক্তি সাধনায় এঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এঁদের ইতিহাস লেখা চলে না।

এইসব যুবকবৃন্দ ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা লাভ করেও সেই লাঞ্ছনাকেই নিজেদের সাধনার বস্তু করে তুলেছিলেন। তাঁদের অগ্রপশ্চাতে cheering crowd জয়ধ্বনি করেনি—জেলে বা নির্বাসনে যাওয়ার অথবা সেখান থেকে ফেরার সময় দেশবাসীর বাহবা তাঁরা পাননি। শুধু হয়তো খবরের কাগজে একটু খবর হয়েই ছিলেন তাঁরা। ফাঁসির কাঠে ঝুললেও তাঁদের জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলার সামর্থ্য দেশবাসীর

হয়নি—বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞদের কথায় তাঁরা কেবল ভুল করেছেন, তাঁদের কথা কিভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব।

বাংলার বিপ্লববাদীদের দেশবাসী সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী অথবা অরাজকপন্থী আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংরেজ রাজকর্মচারীরা তাঁদের কার্যকলাপের ব্যাপকতা জানতে পেরে বলেছিলেন—এরা কেবল এ্যানার্কিষ্ট, টেরোরিস্ট নয়, এঁরা স্বাধীনতা প্রয়াসী[১১]—বিপ্লববাদী নলিনীকিশোর গুহ, যিনি নিজে একজন বিপ্লববাদী ছিলেন, তাঁর এই চিন্তাধারার প্রকাশ তাঁর গ্রন্থ 'বাংলায় বিপ্লববাদে' পাওয়া যায়। অধ্যাপক ঐতিহাসিক ডঃ অমলেন্দু দে আরও সম্মানজনক আখ্যায় এইসব মাতৃমুক্তিকামী পাগল ঘরছাড়াদের অভিহিত করেছেন "জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী" বা "Nationalist revolutionaries" বলে।[১২]

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" স্বদেশী যুগের বাঙালী যুবকরা এই ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কিন্তু সেই আগুনের খেলায় জাতি হিসেবে বাঙালী তথা ভারতবাসীর সায় ছিল না।

বাংলায় যে বিপ্লববাদ পরিধি লাভ করেছিল তা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, সাধারণতঃ নব্য বাঙালী সমাজেই বিস্তৃত ছিল, সেই সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলার সাধারণ মন অর্থাৎ আপামর জনসাধারণকে তা সমভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব একটা জাতিতে হঠাৎ সম্ভব হয় না। যদিও জাতীয় জীবনে সেই বিপ্লবের ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। বাংলায় বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বাহ্নেই বিপ্লবের যোগ্য মন বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রস্তুত হয়েছিল। ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বাঙালীর মনে সর্বপ্রথম তাই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাও জেগে উঠেছিল ব্যাপকভাবে।

নদীয়ায় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রভাবে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম এক বিচিত্র নবীন রাগে রাঙা হয়েছিল। মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে দেখবার প্রয়াস সে যুগে বাঙালীকে পাগল করে তুলেছিল। তার পরবর্তী পর্যায়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর পুরাতনের বন্ধনকে ভাঙবার আয়োজন শুরু করেছিলেন—মুক্তির জন্য এই যে ব্যাকুলতা, এই যে বন্ধনকে, অবসাদকে, হীনতা ও মিথ্যাকে ভেঙে ফেলতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষায় বিদ্রোহ—এখানেই বিপ্লবী মনের গোড়াপত্তন ঘটেছিল।

নতুনের নেশায় পুরোনোকে, মুক্তির আগ্রহে বন্ধনকে ভাঙবার ছিঁড়ে ফেলার উন্মাদনা যুবসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল যাঁদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আদর্শ-নিষ্ঠা, ত্যাগ ও দৃঢ়তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভ্রান্তি বলে ভাবা ভুল। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,

এই টাটকা চিত্তগুলি ছিল জাতির সম্পদ। পার্কে বসে জোর করে 'অভক্ষ' ভক্ষণকে আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁদের মুক্ত হবার বাসনাও শ্রদ্ধা করার।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই জাতির কাছে নানাভাবে 'মুক্তি'ই প্রচার করেছিলেন যার প্রত্যক্ষ ফল বন্ধনহীন, মুক্ত, তাজা মন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সেই মনের মালিক বাংলার যুবকগণ দেশাত্মবোধের এক নতুন ধারায় মেতে এক অপূর্বপথে যাত্রা শুরু করেছিল। [বাংলায় বিপ্লববাদ পৃ. ৪-৫]

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল মিঃ অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের প্রেরণা এবং বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উৎসাহ। ইংরেজের ভারত জয়ের মূলে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত ছিল এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় সেই চেতনাকে বিধিবদ্ধ গণআন্দোলনের খাতে প্রবাহিত করে আয়ত্তে রাখলে গণবিদ্রোহ দেখা দেবে না—মাঝে মাঝে সময় সময় ভারতবাসীর জন্য কিছু শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করলেই চলবে—ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এই চিন্তা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজের এই ভুল ভাঙে।[১৩]

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ঃ

জাতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০২ সাল বা তাঁর পূর্ব থেকেই বাংলার শিক্ষিতজনের মন যখন পরাধীনতার দুঃখ লজ্জা থেকে মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল সেই সময় ১৯০২ সালের ২৪ শে মার্চ দোলপূর্ণিমায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি.মিত্র) এই সমিতির সভাপতি ছিলেন আর তাঁর সহকর্মী ও সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও সতীশচন্দ্র বসু। বিপ্লবী বাংলার মন্ত্রগুরু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর "সন্ন্যাসীর গীতি" বিপ্লবীদের কণ্ঠস্থ ছিল। দেশের তরুণদের প্রতি বিবেকানন্দের বাণী—"Heaven is nearer through football than through Gita. We want men of strong biceps. Awake, arise, stop not till the goal is reached."—জাতির প্রাণে সম্বিৎ এনে দিল। জাতি দৃঢ় সংকল্পে ব্রতী হল।[১৪]

বিপ্লবী দলের শীলমোহর
স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা।

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ ঘটে। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বামীজির উদ্বোধন মন্ত্রে জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের তৎকালীন প্রতিষ্ঠা যে মূল্যহীন বেদান্ত কেশরী তা বুঝতে পেরে সমগ্র জাতিকে সমপ্রাণতার বাণী দান করেন। দীন, দরিদ্র, কৃষক মজুরই জাতির মেরুদণ্ড, শক্তি রয়েছে এদের মাঝে। এরাই জাতির ভরসা, তথাকথিত শিক্ষাভিমানী ভদ্রগণ নয়—দেশাত্মবোধের এই মর্মকথা স্বামীজি ঘোষণা করেন। [বাংলায় বিপ্লববাদ পৃ. ২৩]

ব্যারিস্টার পি. মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' নামক প্রবন্ধ থেকে 'অনুশীলন' এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন। 'অনুশীলন' এই নামের মধ্যেই অনুশীলনের মতবাদ নিহিত আছে। অনুশীলনের নেতারা এমন একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। অনুশীলনের চিন্তাধারায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব যা শুধু অনুশীলনের দ্বারাই সম্ভব।

অনুশীলন-কল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হবে। অনুশীলন কল্পিত সমাজে—প্রত্যেক নরনারী হবে বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু এবং এর জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। সেই সমাজে স্বাস্থ্যহীন, চরিত্রহীন, ভীরু অথবা দরিদ্রের স্থান নেই। মানুষের সমাজ থেকে ধন বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য,

সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করে সব মানুষের মধ্যে সমতা আনতে হবে। এ কাজ একমাত্র জাতীয় সরকার দ্বারাই সম্ভব। স্বাধীনতা ছাড়া এ অবস্থা সম্ভবপর নয়। তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা কোন বিশেষ শ্রেণীর নয়, এ স্বাধীনতা দেশের সর্বজনের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৫]"

অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও দীক্ষা ঃ

সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের রোজ বিকেলে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা ইত্যাদি স্বাস্থ্যচর্চা করতে হত। প্রতিদিন খেলার মাঠে যখন নাম ডাকা হত অনুপস্থিত সভ্যকে কারণ দেখাতে হত। অনুপস্থিত, অনৈতিক, অ-নিষ্ঠাবান বা নিষ্ঠাহীন সভ্যর নাম সমিতি থেকে কাটা যেত। যেসব সাধারণ সভ্য কর্মঠ, চরিত্রবাণ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করতেন তাঁদের আদ্য প্রতিজ্ঞা করানো হত।

আদ্য প্রতিজ্ঞা ঃ

"আমি এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না, আমি আমার চরিত্র সর্বদা নির্মল ও পবিত্র রাখিব। আমি সকল সময়ই সমিতির বিধিনিষেধ মানিয়া চলিব। আমি সমিতির কর্তৃপক্ষের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না।"

এইসব সভ্যদের মধ্য থেকে আবার বেছে যাঁদের বিপ্লব দলের উপযুক্ত বলে মনে হত তাদের দিয়ে মধ্যপ্রতিজ্ঞা করানো হত।

মধ্য প্রতিজ্ঞা ঃ

"আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দ্দেশ ব্যতীত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। যদি কোন সময় সমিতির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। আমি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে পরিচালকের নির্দেশ পালন করিব।"

এই সভ্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে অন্ত্য প্রতিজ্ঞা করানো হত।

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা ঃ

"আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতা, মাতা, ভগিনীর স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিব।"

এইসব সভ্যদের মধ্যে যাদেরকে সমিতির কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে

মনে করা হত তাদেরকে বিশেষ প্রতিজ্ঞা করানো হত।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা ঃ

"আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না, অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না।"

প্রতিজ্ঞা করণের সময় সাধারণতঃ কোন মন্দিরে দেবীর সম্মুখে দীক্ষা দেওয়া হত। পুলিন বিহারী দাশ দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন পি. মিত্রের নিকট। সেই দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী ছিল এইরকম—আগের দিন এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে, সংযমী হয়ে, পরদিন ভোরে স্নান করে দীক্ষাগ্রহণ করতে হত। দেবীর সামনে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজিয়ে, বৈদিকমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ করতে হত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসে (বাম হাঁটু গেড়ে শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মাথায় গীতা স্থাপন করা হত। গুরু শিষ্যের মাথায় অসি রেখে দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান থাকতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সামনে দুই হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরে প্রতিজ্ঞা পাঠ করতেন।

পুলিনবিহারী দাশ ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের রমনা-সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীতে বা বুড়া শিবের মন্দিরে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক সভ্যকে দুধ-ঘি, চিনি মেশান এক গ্লাস সরবৎ পান করতে দেওয়া হত। আদ্য প্রতিজ্ঞার সভ্যরা প্রাথমিক সভ্য এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞার সভ্যরা পূর্ণ সভ্য (full fledged member) বলে গণ্য হত। কেউ ইচ্ছা করলেই যখন খুশী অনুশীলন সমিতির সভ্য হতে পারত না, যখন ইচ্ছা তখন দল ছেড়ে যেতেও পারত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে ছিল কেউ দলত্যাগ করলে সমিতির সম্পর্কে তার জ্ঞান নষ্ট (knowledge destroy) করতে হবে। অর্থাৎ দলত্যাগ করে পাছে সে দলের অনিষ্ট করে বা গুপ্ত খবর প্রকাশ করে এজন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য অনুমতি নিয়ে গৃহী সভ্য হিসেবে তারা থাকতে পারত। [উপরোক্ত তথ্যাদি জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থটি থেকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে পৃ. ১৬-১৯]

বিপ্লবীদের মন্ত্র ছিল মুকুন্দ দাসের গান—

"ভয় কি মরণে—রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"[১৬]

প্রফুল্লকুমারের দীক্ষাগ্রহণ ঃ

প্রফুল্লকুমার অনুশীলন সমিতির ভাবধারায় স্কুল জীবনেই উদ্বুদ্ধ হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে দীক্ষাগ্রহণ করে সরাসরি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিজের দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'আত্মকথা' বা অন্য কোথাও কখনও তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, —"পার্টির মন্ত্রগুপ্তির কথা জীবদ্দশায় বলা বারণ।" পরিণত বয়সে পারিবারিক দীক্ষাগ্রহণের সময় যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ির সময় তিনি বলেছিলেন, —"আমার দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং দীক্ষা জীবনে একবারই হয়।" মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন বার্ধক্য জনিত কষ্টভোগে সারারাত তাঁকে জেগে কাটাতে হয়েছিল। অশেষ যন্ত্রণায় শুধু মা কালীর নাম উচ্চারণ করেছিলেন। তার থেকে ধারণা করা যায় যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত প্রতিজ্ঞাপত্র ও দীক্ষা প্রফুল্লকুমারের জীবনেও ঘটেছিল এবং সারাজীবন মা কালীই ছিলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও পলাতক জীবন

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর "স্মৃতির আলোয়" লিখেছেন যে প্রফুল্লকুমার বিপ্লবী পার্টির সংস্পর্শে আসেন অতীন রায়, অমূল্য মুখার্জীর সাথে। বিপ্লবীদের জীবন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সমিতিতে দু'ধরনের সদস্য ছিলেন। একদল ছিলেন সংগঠক যাঁরা সংগঠন তথা সমিতির প্রচারের দিক দেখাশোনা করতেন। অপরদল কর্মী যাঁরা সক্রিয় ছিলেন action group হিসাবে। প্রফুল্লকুমার অনুশীলনের সংগঠন বৃদ্ধির কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের কিছু অংশ, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশালের ভোলা মহকুমার নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে অনুশীলনের শাখাকেন্দ্র স্থাপনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পালং এর সীতানাথ দে, রাধাবল্লভ গোপ (ফরিদপুর, পরবর্তী জীবনে R.S.P.I দলের নেতা, অকৃতদার এই বিপ্লবী), প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখের সঙ্গে সংগঠনের কাজের সূত্রে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

পল্লীসংস্কার সমিতির কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে Lantern lecture বা আলোকচিত্রের সাহায্যে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রচারের কাজে যে সতেরোজন যুবককে নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রফুল্লকুমার ছিলেন তাঁদের একজন। প্রফুল্লকুমারকে এই কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করে মনোনীত করেন কুমিল্লার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অতীন্দ্রমোহন রায়।[১৮] প্রফুল্লকুমারের এই সময়কার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে "Terrorism in Bengal Vol. II" তে "A Brief history of Tippera Anushilon Samiti" তে (পৃঃ ১১০৫) যা পাওয়া যায় তার বাংলা অনুবাদ করলে দেখা যায় যে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা (একটি সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান) প্রফুল্লকুমার সেনের ট্রেনিং এর জন্য অর্থব্যয় করে এবং তাঁকে বিভিন্ন জেলায় সামাজিক সেবামূলক কাজ করার জন্য মাসিক ৫০ টাকা মাইনেতে নিযুক্ত করেছিল। প্রফুল্লকুমারও এই সুযোগে যুব সমাজে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজ চালাতেন। ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সমর্থন যোগাড়ের জন্য তিনি যে প্রচার চালাতেন তা এককথায় ছিল অনুশীলন সমিতিরই প্রচার।

পরবর্তী পর্যায়ে ঐ বই (Terroigm in Bengal Vol. II)-এর ১১০৮ পৃঃ

পাওয়া যায় যে প্রভাত চক্রবর্তী ধরা পড়ার পর ১৯৩০ এ ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে কুমিল্লা স্টেশন ক্লাব (ইউরোপীয়ান ক্লাব) প্রাঙ্গণ আগুনে ভস্মীভূত হয়। সেই সময়ে প্রফুল্লকুমার সেনের ল্যান্টার্ন লেকচার (Lantern Lecture) এর মাধ্যমে প্রচারের সবচেয়ে আকর্ষক বিষয় ছিল "বিপ্লবী বাংলা"।

প্রফুল্লকুমার তাঁর 'আত্মকথা'য় যা বলেছেন তার থেকে জানা যায় যে তাঁর কার্যকলাপ শুধু কুমিল্লা জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে পরিচয় বাড়ানোর জন্য তাঁকে কুমিল্লা ছাড়া নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোরেও যাতায়াত করতে হত। ফলে ইংরেজ সরকারের বিষ দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে এবং তাঁর যাতায়াতের পথে নানা বাধা সৃষ্টি করে গতিরোধের চেষ্টা চালানো হত।

সমসাময়িক বাংলার পরিস্থিতির যে চিত্র পাওয়া যায় "দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত"র "স্মৃতির আলোয়", তাতে দেখা যায় ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনীতিতে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নবচেতনার উন্মেষ। এই ছাত্র আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছিল যুগান্তর ও অনুশীলনের বিভেদ।[১৯]

"যুগান্তর" ছিল অনুশীলন দলের মুখপত্র। ১৯০৬ সনের ১৮ই মার্চ যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), লেখকদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জী প্রভৃতি ছিলেন। ঐ সময় যুগান্তরের লেখনী থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হত। এই পত্রিকা খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটিশ সরকার যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়। যুগান্তর কিন্তু বন্ধ হল না গোপনে বের হত। সকল দলের লোক যুগান্তর পত্রিকা নিজের মত মনে করে প্রচার চালাত।

অনুশীলন সমিতির কাজ কিছুদূর এগোনোর পর পি. মিত্র ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মধ্যে কর্মপন্থা নিয়ে মতভেদ ঘটে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি হিংসাত্মক কাজকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রবীণ নেতা মিত্র মহাশয় গঠনমূলক কাজের উপর জোর দেন। ফলে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ 'যুগান্তর' নাম গ্রহণ করে নিজেদের অনুশীলন থেকে আলাদা করে নেন। ফলে যুগান্তর নামে একটি শাখা দলের উদ্ভব ঘটে।[২০]

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে যুগান্তর প্রভাবিত সংঘ সমর্থন করেছিল সুভাষ বসুকে আর অনুশীলন সমর্থন করেছিল যতীন্দ্রমোহন সেনকে। মিলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল কিছুদিন। কুমিল্লা থেকে যোগেশ

চক্রবর্তী (ইনি প্রফুল্লকুমারের স্কুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন) এসে আলোচনা শুরু করেন। গোপনভাবে আলোচনা চলার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয় জগন্নাথ দীঘির পাড়।[২১]

বাংলায় বিপ্লবী গোষ্ঠী ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁদের প্রচার চলত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পথে। লাঠিখেলা, ব্যায়াম, যুযুৎসুর অভ্যাস আরও বাড়ছিল, গান্ধীজী প্রদর্শিত মত ও পথে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার স্বপ্ন তাঁদের।[২২]

কুমিল্লা সংগঠনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড

কুমিল্লা ছিল অনুশীলন সমিতির একটি প্রধান কেন্দ্র। গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্যায় থেকে কুমিল্লা অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রবিন্দু। গুপ্ত সমিতির কাজে এই জেলার কিংবদন্তী নেতাদের মধ্যে যোগেশ চ্যাটার্জী, অতীন রায়, প্রভাত চক্রবর্তী, অমূল্য মুখার্জি ও যোগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দেশগঠনের কাজে পরিকল্পিত শিল্প গড়ে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কাজেও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। কুমিল্লায় Labour House গড়ে ওঠে। কুমিল্লা জেলায় অনুশীলনের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনুশীলন সমিতির সংগঠক ও কর্মীদের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলাফেরা করতে খুব অসুবিধা হত না।[২৩] তবে সংগঠনের কথা চিরকাল অনুচ্চারিত রাখতে হয় বলে প্রফুল্লকুমারের দৈনন্দিন বৈপ্লবিক কাজের বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অনুশীলনের অপর সদস্যদের লেখা থেকে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে অনুশীলন সমিতি তখন সারাদেশে ব্যাপকভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সংগ্রাম শুরু করে। সভ্যদের চেতনায় ছিল সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের পরিধি বাড়িয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানো এবং সেই সঙ্গে যুবশক্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামোর উপর সুবিন্যস্তভাবে আক্রমণ শানিয়ে প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেওয়া। ["স্মৃতির আলোয়" পৃ. ৭-৮]

অনুশীলন সমিতি যখন সারা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আরও ব্যাপক ভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই ঘটে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই কাজের প্রভাব এসে পড়ে অনুশীলন সমিতির উপর। ফলে গুপ্ত সমিতির কাজের ধারার পরিবর্তন ঘটাতে হয়।[২৪]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-এর পরে বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কনফারেন্স (Bengal Provincial Conference অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন) বসেছিল রাজসাহীতে। প্রফুল্লকুমার কুমিল্লার প্রতিনিধি হিসেবে এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রভাত চক্রবর্তী, যতীন রায়

(ফেগুদা), রবি সেন, আশুকালী (কাহালী) প্রমুখ ব্যক্তি ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। পুলিশ কনফারেন্স স্থল ঘেরাও করে অনুশীলনের নেতা ও প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করে। ত্রৈলোক্যনাথ (মহারাজ) এই স্থানে ধরা পড়েন। যতীন রায়, অমূল্য মুখার্জী, প্রভাত চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে পালিয়ে প্রফুল্লকুমার গ্রেপ্তার এড়ান। তদানীন্তন সরকার তাদের absconder বা পলাতক আসামী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে পুরস্কার ঘোষণা করে। এই সময় থেকে প্রফুল্লকুমারের পলাতক জীবন শুরু হয়।[২৫]

প্রফুল্লকুমারের পলাতক জীবনের কার্যাবলী

"Terrorism in Bengal Vol.II" তে (পৃঃ ১১২১তে) প্রফুল্লকুমারের কার্যাবলীর কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। পুলিশী তল্লাসী বৃদ্ধি করে, জেলা I.B. অফিসে লোকের সংখ্যা বাড়ীয়েও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ অনুশীলন সমিতি নামক সংগঠনটির ভিত ছিল সুদৃঢ়। বলা বাহুল্য এর শাখা বিভাগগুলি সমগ্র জেলায় ছড়ানো ছিল। কুখ্যাত পলাতক "notorious absconder" প্রভাত চক্রবর্তী, জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী এবং প্রফুল্ল সেন সমস্ত অঞ্চলে অনিষ্ঠ সাধনে ব্যাপ্ত ছিল।

পলাতক জীবনের ঘটনাবলীর কিছু বিবরণ প্রফুল্লকুমার তাঁর 'আত্মকথা'য় দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় যে, ফরিদপুরের পালং থানার ছয়গাঁ গ্রামে বিপ্লবীরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। পুলিশ গুপ্তচর মারফৎ সেই মিটিং-এর খবর জোগাড় করে এবং মিটিং শেষ হওয়ার পূর্বেই গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে বিপ্লবীদের গ্রেফতারের চেষ্টা করে। অনুশীলন সমিতির কয়েকজন দক্ষ কর্মী সেখানে গ্রেফতার হন। জীবন সায়াহ্নে প্রফুল্লকুমার তাঁদের নাম স্মরণ করতে পারেন নি। তবে তিনি নিজে ঐদিন গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন। তাঁর জবানী থেকে জানা যায় ঐ মিটিং-এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল জেলের ভিতর থেকে পাওয়া কিছু খবর। যেমন পার্টি অর্থাৎ অনুশীলন তার পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে সোস্যালিস্ট ভিউ (Socialist view) নিয়েছে। এই খবরের সত্যতা নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে সংশয় ছিল। ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। নেতাদের মধ্যে অনেকে তখন জেল হাজতে কারারুদ্ধ। এই দুর্দিনে দলকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার জন্য কিছু কর্মীর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। দলের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। প্রফুল্লকুমার এই ঝামেলায় উত্যক্ত হয়ে উভয়পক্ষকেই এড়িয়ে বরিশাল জেলার গাভা এবং বানরীপাড়ায় সমিতির কাজের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। এ সম্বন্ধে বিপ্লবী

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" বলেছেন যে, সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকজন কর্মীকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ বিশেষ জেলাতে প্রেরণ করা হয়। সে সিদ্ধান্ত অনুসারে—প্রফুল্ল সেন বরিশাল অঞ্চলে, ফরিদপুরে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবব্রত দে সিলেট, হরিকুমার চৌধুরী ত্রিপুরায় এবং শচীন দত্ত সংগঠনের সর্বাধিনায়করূপে এইসব অঞ্চলে কাজ করতে থাকেন।[২৬]

Terrorism in Bengal Vol II (পৃঃ ১১১৩-১১১৪) থেকে জানা যায় যে ছাত্র এবং যুব সংগঠনগুলি ১৯৩২ সালে বেআইনী ঘোষিত হয়। বিভিন্ন সেন্টারগুলি এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে কুমিল্লা কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন অতীন্দ্র রায়চৌধুরী, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, অমূল্য মুখার্জী এবং জগদ্বন্ধু চক্রবর্তী এবং নেতৃস্থানীয় যেসব কর্মী তাঁদের সাহায্য করতেন তাঁরা ছিলেন—

১। অনন্ত দে—দে দত্ত এবং কোম্পানীর

২। খগেন্দ্র ধর

৩। প্রমোদ ওরফে মাখন দাস

৪। ভূপেন্দ্র সরকার

৫। কুমুদ সেন

৬। **প্রফুল্ল সেন (টিটাগড় মামলা)—একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক যাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্তরের যোগাযোগ ছিল।**

৭। প্রফুল্ল নন্দী

৮। হরিকুমার রায়চৌধুরী চাঁদপুর

পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" উল্লেখ করেছেন যে Inter Provincial Conspiracy Case এ নেতৃবৃন্দ ধরাপড়ার পর সংগঠনের সব দায়িত্ব হীরালাল পাল, দেবপ্রসাদ সেন, হরিকুমার চৌধুরী, প্রফুল্ল সেন, দেবব্রত দে এই পাঁচজনের উপর এসে পড়ে। সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা নিয়ে একটি জোন তৈরি করা হয়। এই জোন-এর দায়িত্বে ছিলেন প্রফুল্ল সেন ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কুমিল্লা সিলেট, নোয়াখালী জোন এর দায়িত্বে ছিলেন হরিকুমার চৌধুরী ও দেবব্রত দে। সমস্ত উত্তরবঙ্গে ভেঙে যাওয়া সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ করে সেই সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হীরালাল পালকে।[২৭]

বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা জোনের দায়িত্বে প্রফুল্লকুমার

তাঁর নিজের 'আত্মকথা'য় প্রফুল্লকুমার যতটুকু জানিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি ঐসব অঞ্চলেই কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মী নিয়ে 'ginger group' চালাতে থাকেন। বানরীপাড়ায় ফনী চ্যাটার্জি, ভূপেশ গুহঠাকুরতা (কাঠু), হরলাল গাঙ্গুলী, নলিনী দাশগুপ্তের সহযোগিতায় তিনি সমিতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা অদম্য মনোবল নিয়ে সমিতির কাজ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প নেন। অনুশীলন সমিতিতে যোগদানের ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের ভালো ছাত্রদেরই দলে টানা হত। সেই সব সদস্যদের মধ্যে গাভার মুকুন্দ চক্রবর্তী, কুলেশ সরকার, বানরী পাড়ার নির্মল গুহঠাকুরতা, সাধনানন্দ গুহঠাকুরতা, তারাপ্রসাদ গুপ্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই স্কুলের ভালো ছাত্র ছিলেন।

'অনুশীলন' বারবার মতভেদের জন্য ভাগ হয়ে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে অনেকগুলি বিপ্লবী দলও ছিল। কিন্তু এই দলগুলি শুধু দলাদলি করেছেন একথা সত্য নয়। বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীরা অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা তো করেনইনি বরং আপদে বিপদে একে অপরকে সাহায্য করতেন। দুটি ঘটনার উল্লেখ এ বিষয়ে একটি ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমত টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে তা এই ঃ আসামী প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে যে ফেরারীকে কালীপদ ভট্টাচার্য আশ্রয় দিয়েছিলেন—সেই ফেরারী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী ক্ষীরোদ। দ্বিতীয়তঃ, "টিটাগড় মামলার প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বলেন যে বরিশাল সংস্থার বিপ্লবী নায়ক বিখ্যাত মনোরঞ্জন গুপ্তের ভ্রাতা নিশিকান্ত গুপ্ত ছিলেন বরিশাল চন্দ্রহার স্কুলের শিক্ষক। প্রফুল্ল সেনদের ফেরারী জীবনে (বরিশালে) তিনি নানাভাবে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন (১৯৩৩-৩৪ সালে)। প্রফুল্ল, সীতানাথ দে, গাভার মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি ফেরারীগণের আদর্শ জীবন ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া উদার হৃদয় নিশিকান্ত বলেন—আপনাদের কোন দল নাই, জাত নাই, আপনারা খাঁটি বিপ্লবী, ওসবের উর্দ্ধে। আপনাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো মনে হয় নাই, যে আমাদের মধ্যে অনুশীলন, যুগান্তর বলিয়া কোন দল বা দলাদলি আছে।"[২৮]

"বাংলার বিপ্লবীদের অগ্নিযুগের নেতা বা কর্মীও বলা হয়। কিন্তু সে অগ্নিযুগ ছিল দেশপ্রাণতার, ত্যাগ—তপস্যার—তেজের আগুণে স্বার্থ বিসর্জনের অগ্নিশুদ্ধ দেশসেবার যুগ—ট্রামবাস—ট্রেন গাড়ী ও বাড়ীতে আগুন দিবার যুগ নয়!"[২৯]

ধীরে ধীরে প্রফুল্লকুমারের সাথে সতীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কেষ্টপদ চক্রবর্তী, প্রাণকৃষ্ণ

চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তাঁরা একযোগে সংগঠনকে জোরদার করে তোলেন।

দেবপ্রসাদ সেন প্রফুল্লকুমারের বরিশাল অঞ্চলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" লিখেছেন—"পুলিশের নজর এড়িয়ে, তাদের ফাঁকি দিয়ে আরও কয়েকবার আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। সেসব কথা মনে হলে আজও রোমাঞ্চ অনুভব করি। কাজের জন্যই আমাকে মাঝে মধ্যে যেতে হত বরিশাল। সেখানের দায়িত্বে ছিলেন প্রফুল্ল সেন। ছোটখাট মানুষটি কিন্তু অতীব পরিশ্রমী। বরিশাল ছিল আমাদের একটি সংগঠিত এলাকা। এই বরিশাল সংগঠনকে মজবুত করতে প্রফুল্ল সেনের প্রচেষ্টার কথা আমার আজও মনে পড়ে। তাঁর সাথে একান্তভাবে কাজ করতে পেরেছি। তাঁর কাজের গতি ও সাংগঠনিক কলাকৌশল আমাকে আকৃষ্ট করত। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু তার বালকসুলভ চপলতা আমাকে মোহিত করত।"[৩০]

বরিশালে মাঝে মধ্যে গোপনে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হত। দেবপ্রসাদ সেন একবার বরিশালে গিয়ে মুকুন্দ দাসের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা রাত্রে সেখানে থাকতেন নিরাপদ আশ্রয় মনে করে। ভোরে উঠে অন্যত্র সংগঠনের কাজে চলে যেতেন। একদিন আচমকা পুলিশ আশ্রমে এসে তল্লাশী শুরু করে। ফলে বিপ্লবীদের অবস্থা তখন খুবই করুণ। তাদের সেখান থেকে পালানোর সব পথ রুদ্ধ। প্রফুল্ল সেনের কাছে ছিল কিছু কাগজের মোড়ক। তিনি অনেকটা হতবিহ্বল। কি করবেন ভেবে কূল করতে পারছেন না, বিশেষ করে দেবপ্রসাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন। অপরদিকে যেভাবেই হোক কাগজের টুকরোগুলো নষ্ট করাও ভীষণ জরুরী। দেবপ্রসাদ কাগজের পুঁটুলীগুলো মুখে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলেন। পুলিশ তল্লাশী করতে এসে কিছুই না পেয়ে চলে যায়।[৩১] এই ঘটনা থেকে প্রফুল্লকুমারের আশ্রিত জনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সচেতনতার দিকটি উদ্ভাসিত হয়। অপরদিকে দেবপ্রসাদের কাগজের পুঁটুলিগুলো খেয়ে ফেলা থেকে দলের প্রতি আনুগত্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্মৃতির আলো" ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একদিন গোপনভাবে কর্মী সম্মেলন ডাকা হয়েছে বরিশাল শহর থেকে দূরে এক গ্রামে। খাল বিল দিয়ে ঘেরা এই গ্রামটি ছিল বিপ্লবীদের একটি প্রধান ঘাঁটি। গ্রামে মধ্যবিত্তদের বসবাস। স্কুল, নদীপথে ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সুবিধা ছিল এই গ্রামটিতে। মিটিং যথাসময়ে শুরু হয়। হঠাৎ মিটিং শেষ হওয়ার মুখে খবর পাওয়া যায় যে এক বিরাট পুলিশবাহিনী সভার দিকে আসছে। আকস্মিক এই সংবাদে বিপ্লবীদের কোন ভাবনাচিন্তার অবকাশ

ছিল না। সকলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গ্রামের লোকের মধ্যে মিশে যাবার নির্দেশ দিয়ে প্রফুল্ল সেন, বীরেন বসু নামে এক দায়িত্বপূর্ণ কর্মীর হাতে দেবপ্রসাদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার দেন। স্থির করা হয়েছিল—একটি সাঁকো পেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে প্রায় ২০ কি.মি. দূরে গিয়ে প্রফুল্লরা আশ্রয় নেবেন। সাঁকো পার হওয়ার সাথে সাথে বিরাট সার্চলাইটের আলো গায়ে পড়ায় বোঝা যায় যে পুলিশ বিপ্লবীদের পিছু নিয়েছে। ফলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রফুল্ল সেনকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি খুব দ্রুতগতিতে হাঁটতে পারতেন। অন্যত্র দেবপ্রসাদ তাঁর হাঁটার গতির উল্লেখ করেছেন। দেবপ্রসাদের সঙ্গী বীরেন বসু। পথ অজানা, আলো এসে পড়ছে মাঝে মাঝে। রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে কোথাও লুকোতে হবে। একটু বাঁক ঘুরতে দেখা গেল একটি গরুর ঘর। দুজনে সেখানে আশ্রয় নেন। অনেক রাতে যখন চারিদিক নিঝুম, নিথর আবার পথ চলা শুরু করে ২০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে এক গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। বীরেন সঙ্গে থাকায় দেবপ্রসাদ সে যাত্রায় রক্ষা পান। ঐ গ্রামে গিয়ে তাঁরা প্রফুল্ল সেনের দেখা পান। অবস্থা আলোচনা করে ভোর রাত্রে নৌকায় চড়ে এক দূর গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে তাঁরা ওঠেন।[৩২]

বিপ্লবীদের জীবনে "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য" এই প্রবাদটির সত্যতা বারে বারে প্রমাণিত। এইভাবে প্রফুল্লকুমারের ৪৮ মাসের দীর্ঘপলাতক জীবন কেটেছিল (absconding life)। তিনি ছিলেন পিতা শ্রী নবীনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র এবং শৈশবে মাতৃহীন। পলাতক জীবনে সুযোগ পেলে তিনি পিতার সাথে দেখা করার চেষ্টা করতেন। সেই দেখা করাতেও থাকত বিপদের ঝুঁকি। তিনি নিজে এইরকম ঘটনার কথা নিজের কন্যাদের কখনও কখনও বলেছেন। গভীর রাতে কখনও কখনও বাড়ীতে যেতেন পিতার সাথে দেখা করতে এবং ভোরে অন্যত্র চলে যেতেন। একবার সন্ধ্যার সময়ে কাজের শেষে গ্রামে ঢোকার মুখে খবর পেলেন যে গ্রামে পুলিশ তল্লাসী চালাচ্ছে। প্রফুল্লকুমার আর গ্রামে প্রবেশ করলেন না। গ্রামের শ্মশানে একটি বড় বটগাছে চড়ে আত্মগোপন করে রইলেন। রাত ক্রমে গভীর হল। গ্রামে তখন বিজলী ছিল না। কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দেখাও পাচ্ছেন না যাঁর কাছ থেকে কোন খবর সংগ্রহ করবেন। হঠাৎ দেখলেন তাঁর এক মামা শ্মশানের পাশের রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে দ্রুত বাড়ী ফিরছেন। গ্রামে রাত দশটা মানেই নিশুতি রাত। তার উপর শ্মশানের পাশের রাস্তা। প্রফুল্লকুমার গাছের উপর থেকে ডাকলেন "মনা মামা। মনা মামা!" আর যায় কোথায়, মনামামা তো দে দৌড়। প্রফুল্লকুমারও পিছু পিছু ছুটছেন। প্রায় আধকিলোমিটার দৌড়নোর পর প্রফুল্লকুমার তার মনামামাকে ধরতে পারলেন। মনামামার তো ভয়ে অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। প্রফুল্লকুমার

বললেন, "মনামামা ভয় পাবেন না। আমি প্রফুল্ল।" মনামামা বললেন, "ডাকাত কোথাকার? তুই ওখানে কি করছিলি। তোর কি ভয় ডর কিছুই নেই।" সে রাত্রে মনামামার কাছে গ্রাম থেকে পুলিশ চলে যাওয়ার খবর জোগাড় করে বাবার কাছে প্রফুল্লকুমার রাত্রিযাপন করেছিলেন।

একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পলাতক অবস্থায় প্রফুল্লকুমারের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছিল বরিশাল জেলাকে ঘিরে। নদী নালার দেশ বরিশাল। বরিশালের বালাম চাল বিখ্যাত। ধানগাছ এই জেলায় জলের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়। বিলের জল স্বচ্ছ। শালুক ও জলপদ্ম তার শোভা বর্ধন করত। বাংলার গ্রামের এই চিত্র দেখেই কবি লিখেছেন "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।" সেই শান্তির নীড়ের মায়া ত্যাগ করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই জীবনী ইতিপূর্বে অকথিত বিস্মৃত এক বিপ্লবীর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। দেবপ্রসাদ সেন তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" এই বিপ্লবীর পলাতক জীবনের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন— "ফরিদপুর থেকে বরিশাল যাতায়াত পথে গিয়েছি রাস্তার দু'পাশে অনেক গ্রামে। সাথে অবশ্য থাকত প্রফুল্ল সেন। আমরা তাকে বলতাম গ্লোব ফুটার। খুব দ্রুতগতিতে হাঁটতে পারতেন। ঘড়ি ধরে দেখেছি তার চলার গতি ছিল ঘণ্টায় ছ'মাইল। দৌড়ে চলতে হবে তার সাথে। বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন প্রফুল্লদা। কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার, আশ্রাফ্উদ্দিন মহাশয়ের সংস্পর্শে কংগ্রেসের কাজ করেছেন। বিপ্লবী পার্টির সংস্পর্শে আসেন অমূল্য মুখার্জী, অতীন রায়ের সাথে। তারপর আত্মগোপন, আমার বয়সে বড়। শ্রদ্ধা করতাম তাঁকে। তিনিও ভাইয়ের মতন ভালবাসতেন। নির্ভরও করতেন আমার উপর খানিকটা। বরিশালের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত সংগঠনের কাজে আমাকে নিয়ে ঘুরেছেন। একদল তরুণকর্মী তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বরিশালে।"[৩৩] এই দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত স্বাধীনতা উত্তরকালে আগরতলায় জীবন কাটান এবং ২০০৪ এর ডিসেম্বরের শেষ দিনটিতে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে, বরিশাল জেলায় অনুশীলন সমিতির সংগঠন এবং প্রফুল্লকুমারের নাম ছিল সমার্থক। তাঁকে ছাড়া বরিশাল সংগঠন সম্বন্ধে ভাবা যেত না। "স্মৃতির আলো"তে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত একথার উল্লেখ করেছেন। "বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয় জেল থেকে পলায়নের পর তিনি সব সংগঠকদের সাথে মিলিত হন। দায়িত্ব বুঝাবার জন্য খবর দিতে হয়েছিল বরিশালে প্রফুল্ল সেনকে, সিলেটের দেবব্রত দে কে। প্রফুল্ল সেনের উপর এক বিরাট অঞ্চলের

দায়িত্ব ছিল, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চল, তার যোগাযোগ ছিল পূর্ণানন্দবাবুর সাথে। উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রয়োজনে সংগঠনকে তার অঞ্চলে যেন গুটিয়ে নিতে পারা যায়।"[৩৪]

প্রফুল্লকুমার কখনও কখনও স্মৃতিচারণকালে পলাতক জীবনে পুলিশের হাত থেকে গ্রেফতার এড়ানোর আরও কিছু ঘটনা বলেছেন যা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। একবার গোটাগ্রাম পুলিশ ঘিরে ফেলে তল্লাশী চালাচ্ছে। প্রফুল্লকুমারের সঙ্গে কোন বিপ্লবী ছিলেন আজ আর তাঁর নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। দুজনে আশ্রয় নিয়েছেন ধান ক্ষেতে। গোটা দেহ জলের তলায়। শুধু নাকটুকু উপরে। ধানক্ষেতে বড় বড় জোঁক ও মশা। দুই বিপ্লবীর দেহে কামড় দিচ্ছে। অথচ নড়াচড়া করলে অর্থাৎ ধানগাছ নড়লেই পুলিশের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষিত হবে। ফলে উভয়ে নিশ্চুপে সেখানে কাল অতিবাহিত করেন। পরে পুলিশ চলে গেলে যখন দুই বিপ্লবী ধানক্ষেতের বাইরে এলেন তাঁদের গোটা দেহ জোঁকের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। মাতৃমুক্তির সাধনায় তাঁরা যে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তো সব দৈহিক কষ্ট জয় করতে পেরেছিলেন। কন্যারা প্রশ্ন করলে বলতেন, "দেখ, প্রথম কিছুক্ষণ কষ্টের অনুভূতি হতে থাকে তারপর সেই কষ্টবোধটা আর থাকে না।" এই ভাবেই পরবর্তী জীবনে নানা কষ্টকে তিনি যে জয় করেছেন তার পরিচয় ঘটবে।

সতীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কেষ্টপদ চক্রবর্তী, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতি বিপ্লবীর মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা একযোগে সংগঠনকে জোরদার করেন। এদের মধ্যে বানরীপাড়ার পতুবাবুর (শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা) নাম উল্লেখযোগ্য। প্রফুল্লকুমার তাঁর "আত্মকথায়" পতুবাবু সম্বন্ধে উচ্ছসিত—"পতুবাবু ছিলেন ভালো খেলোয়াড়, শান্ত, সৌম্য এবং অনুশীলনের নীরব কর্মী। তাঁকে তখন ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার এক গণ্ডগ্রামে পতিতালয়ের পাশে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। তার সম্বন্ধে প্রফুল্লকুমার "আত্মকথায়" এই অভিমত পোষণ করেন যে "এইভাবে ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা করত বিপ্লবীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাতে।" প্রফুল্লকুমার খবরের কাগজে এই সংবাদ পাঠ করে "অগৌণে" (কালবিলম্ব না করে) সেখানে যান। তিনি পতুবাবুকে চিনতেন না। কিন্তু এই সংবাদ জানা ছিল যে পতুবাবু একজন ভালো খেলোয়াড়। সুতরাং খেলার মাঠে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এই ধারনা নিয়ে তিনি খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাঠে অপেক্ষা করতে থাকেন। সন্ধ্যায় খেলা শেষ হতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরিচিত হন। তিনি পরদিন ঠিক ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। পরদিন প্রফুল্লকুমারের প্রবল জ্বর হয়। পতুবাবু প্রফুল্লকুমারকে ডিটেনশন ক্যাম্প-এ (detention camp) তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং সেবা শুশ্রূষা

করেন। প্রফুল্লকুমার তাঁর বন্ধু বাৎসল্যের পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ হন। ধীরে ধীরে পতুবাবু তাঁর কার্যকলাপের কথা প্রফুল্লকুমারকে জানান। প্রফুল্লকুমার তখন আশেপাশের গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। হাড়োয়ার মুসলমান তালুকদারেরা সন্ধ্যের পর প্রফুল্লকুমারকে তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে রাজী হন। পতুবাবুর সঙ্গে আমৃত্যু প্রফুল্লকুমারের স্নেহমিশ্রিত বন্ধুত্ব ছিল। অত্যন্ত সৎ পতুবাবু প্রফুল্লকুমারের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। আশির দশকে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। অবহেলিত, বিস্মৃত দেশমাতৃকার সেবায় একান্ত নিবেদিত প্রাণ সৎ, নিরহঙ্কার এই বিপ্লবী শেষ জীবনে বড় কষ্ট পেয়েছেন। মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি ছিল অমলিন। এরূপ বহুব্যক্তি যাঁরা প্রচারের আলো থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন, জাতির ইতিহাসে স্থান না পেয়ে আজ তাঁরা চিরতরে হারিয়ে গেছেন।

প্রফুল্লকুমারের "আত্মকথা" থেকে জানা যায় যে হাড়োয়ার মুসলমান তালুকদারেরা তাঁকে সন্ধ্যার পর আশ্রয় দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায় যে অনুশীলনের সদস্যদের দীক্ষা হিন্দুদের কালীমূর্তির সামনে হত এবং দীক্ষার সময় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতা মাথায় ধারণ করতে হত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণ তাই এই আন্দোলনে যোগদান করেনি। আবার উপরের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বিপ্লবীরা স্বীয় ক্ষমতা বা ব্যবহারে ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের মুগ্ধ করে তাঁদের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছিলেন। তখনকার গোঁড়া সমাজব্যবস্থায় প্রফুল্লকুমার মুসলমান গৃহে অন্নগ্রহণ ও রাত্রিযাপন করেছেন। প্রফুল্লকুমার পরে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁরা পাঁঠার মাংস সব্জী দিয়ে রান্না করে নিরামিষ মাংস বলে এই বিপ্লবীকে খেতে দিতেন যাতে তিনি খেতে কোন অসুবিধা বোধ না করেন। এই ছিল তৎকালীন বাংলার জনগণের অতিথি বৎসলতার এক রূপ।

হাড়োয়া থেকে connection পেয়ে প্রফুল্লকুমার চলে যান খুলনা জেলার বাগের হাটে। বাগের হাট থেকে আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের কতিপয় ছেলের সাথে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেইসব ছেলেদের ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতায় খুলনা জেলায় প্রফুল্লকুমার অনুশীলনের সংগঠন গড়ে তোলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকীর জমিদার হারাণ রায়চৌধুরীর সাথে প্রফুল্লকুমার পরিচিত হন। তিনি এই বিপ্লবীকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই হারাণ রায়চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার এবং অনন্তকুমার বসু (পরবর্তীকালে প্রফুল্লকুমারের শ্বশুর ও দত্তপাড়া স্কুলের শিক্ষক) তিনজন জাতিতে কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও পৈতা

ধারণ করেন।

১৯৩৪ এর ৮ই মার্চ পুলিশ বরিশাল শহরে অনুশীলন সভ্য শান্তি মিত্রের গৃহ তল্লাশী করে তৎকালে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী প্রফুল্ল সেনের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি সন্দেহজনক পত্র উদ্ধার করেন। প্রফুল্ল সেন ১৯৩০ সাল থেকেই আত্মগোপন করে দলীয় সংগঠন সুদৃঢ়করণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। "তৎকালীন আইন অনুযায়ী তাঁকে পলাতক ঘোষণা করে এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁর সম্পর্কিত আটক আদেশ (detention order) গ্রহণ করবার আহ্বান জানিয়ে কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল।" তৎসত্ত্বেও তিনি সুদীর্ঘকাল আত্মগোপন করে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে পার্টি সংগঠন দৃঢ়ীকরণের কাজ করে যাচ্ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৫]

পলাতক জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

প্রফুল্লকুমারের দীর্ঘ পলাতকজীবন ছিল ঘটনাবহুল। সব ঘটনা জানা যায় না। ফেরারী জীবনের শুরুতে তিনি সব কাগজপত্র এবং নিজের সব ছবি পুড়িয়ে দেন যাতে পুলিশ কোন খোঁজ না পায়। সেই বয়সের একটিমাত্র ছবি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ প্রফুল্লকুমারের বৃদ্ধ পিতা সযত্নে ছবিখানি নিজের বুকে

২৪ বছরে প্রফুল্লকুমার

করে আগলে রেখেছিলেন। পলাতক জীবনে "প্রফুল্লকুমার সেন ওরফে সত্যবাবু, কানুদা মনিদা, মনীন্দ্র রায়, সেজদা, মনোরঞ্জন বোস, নিরঞ্জন রায়, জগৎ, ফাল্গুনী,

অরুণ (দেখা যায় প্রফুল্ল দীর্ঘকাল ফেরারী থাকিয়া বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত দশটি ছদ্মনামে পরিচিত হইয়াছিলেন।")[৩৬] আবার তারাপদ লাহিড়ীর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ইতিহাস" [পৃঃ ১৭৮-১৭৯] উল্লেখ করেছেন যে প্রফুল্ল সেনের দলীয় নাম ছিল 'রাঙ্গাদা'।

প্রফুল্লকুমারের পলাতক জীবনের আশ্রয়দাত্রী অশ্রুত কয়েকজনের কথা প্রখ্যাত বিপ্লবী এবং লেখক নলিনীকিশোর গুহ তাঁর "কত অজানা মানুষ" বইটিতে যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন হুবহু তা তুলে দেওয়া হল।

"বড়দি শিবসুন্দরী"

"কাশীনগর (জেলা—কুমিল্লা) জমিদার বাড়ীর ৺লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বড় মেয়ে বালবিধবা শিবসুন্দরী চৌধুরানী সকলেরই ছিলেন বড়দিদি। শুধু পিতৃগৃহে আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, পরিবারের ভৃত্যাদিই নয়—পল্লীর দীন দরিদ্র ও স্ত্রী পুরুষ সকলের আপদে-বিপদে শিবসুন্দরী সহায়-সান্ত্বনা; সকলেরই তিনি বড়দিদি। এই দয়াবতী শিবসুন্দরীর আশ্রয় পাইয়াছে বহু বিপ্লবী ফেরারী। ঢাকা কলতাবাজার খণ্ডযুদ্ধে নিহত বিপ্লবী তারিণী মজুমদারের তিনি পিসিমা—বগলা, কালিপ্রসন্ন এবং কংগ্রেস নেতা বসন্ত মজুমদারের তিনি ভগিনী।" (বিপ্লবী প্রফুল্ল সেনের তিনি পিসতুতো দিদি। প্রফুল্লকুমারের পিতা শ্রীনবীনচন্দ্র সেনের চিঠিতে প্রফুল্ল কুমারের অর্থের প্রয়োজনে বড়দির সাহায্য নেওয়ার কথা উল্লেখ আছে।)

"একবার বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন ফেরারী জীবনে এই মজুমদার গৃহে, শিবসুন্দরীর আশ্রয়ে অবস্থানকালে কোন সূত্রে পুলিশ সংবাদ পাইয়া প্রফুল্লকে গ্রেফতার করিবার জন্য সদলবলে রাত্রিতে আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করে। প্রত্যুষে পায়খানায় যাওয়ার পথে পুলিশের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াই, —এই অবস্থায়ই শুধু কোনমতে শিবসুন্দরীকে সংবাদটা দিয়াই পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রফুল্ল পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রফুল্লের রিভলবারটি থলি সমেত ফেলিয়া আসিতে হয়। বড়দিদি পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলেন। তাঁহার পূজার কাপড়খানা পরিধান করিলেন— প্রফুল্লের পরিত্যক্ত রিভলবারটি ব্লাউজের ভিতরে পুরিয়া একটি ছোট্ট ভাইপোকে কোলে করিয়া পুলিশ বেষ্টনীর সম্মুখে আসিলেন। বাড়ীর বাইরে যাইতে উদ্যত হইতেই পুলিশ আগাইয়া আসিতেই, এই তেজস্বিনী মহিলা পুলিশকে দৃঢ়কণ্ঠে সাবধান করিয়া বলিয়া উঠেন—খবরদার আমার পূজার কাপড় পরা, আমাকে কেউ ছোঁবে না। পুলিশ এই অবস্থায় একটু সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেই শিবসুন্দরী যথানির্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রফুল্লের রিভলবারটি নিরাপদে তাহার (প্রফুল্লর) হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলেন স্বগৃহে। ঘরে তল্লাস পুলিশ যথারীতিই করিল, —কিন্তু প্রফুল্ল সে যাত্রায়

বাঁচিয়া গেল, তার রিভলবারটিও। এমনই ছিলেন শিবসুন্দরী, সকলের 'বড়দিদি'। ("কত অজানা মানুষ" পৃঃ ৯৯-১০০)

"বানরিপাড়ার পিসিমা"

"বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ গুহঠাকুরতা পরিবারের বড় পশ্চিমের বাড়ীতে সীতানাথ গুহঠাকুরতার ঘরে উঠিয়াছে ফেরারী জীবনে বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন। প্রফুল্লের সুস্থ সবল দেহ ও বুকের পাটা ও চলার ভঙ্গী দেখিয়া পাশের বাড়ীর গ্রাম্য গুপ্তচর নবাগত ভদ্রলোকের সন্ধান নিতে আসে। সীতানাথ বাবুর স্ত্রী অসঙ্কোচে উহাকে জানাইয়া দিলেন—আমার বড়দাদা উত্তরবঙ্গে পুলিশের বড় দারোগা, তারই বড় ছেলে, সবেমাত্র বি.এ পরীক্ষা দিয়ে পিসিমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। তাকে দুদিন শান্তিতে থাকতে দাও বাপু। উত্যক্ত করো না নিরাপরাধকে।

গুপ্তচর তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। পিসিমা তখন প্রফুল্লকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—নিরঞ্জন বলে নাম বলবে, আর আমায় পিসিমা বলে ডাকবে ও পরিচয় দেবে। ছোটছেলে (তাঁর) সাধনকে সাবধান করে বলে দিলেন তোমার পিসতুতো দাদা, নিরঞ্জন, চিনে রাখ, এদের মতো মানুষ হও; একটু বেড়িয়ে নিয়ে এসো দাদাকে। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে এসে দাদার কাছে পড়া বুঝে নিও, দাদাকে শ্রদ্ধা করো—বলা বাহুল্য দুই বৎসরের মধ্যেই সাধনের ছাত্র জীবনেই এই শ্রদ্ধা তার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ী পরাইয়া আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রসিদ্ধ টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় প্রফুল্লের অনুগামী করে। তাতেও কিন্তু উক্ত ভদ্রমহিলা তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য দুঃখ করেন নাই, বরং আলিপুর কারাগারে পুলিশের সামনেই interview দেবার সময়ে ইঙ্গিতে সাধনকে সাবধান করিয়াই বলিয়া গেলেন, সাধন তোমার পরীক্ষা নিকটবর্তী। আমাদের বিখ্যাত পরিবারের ছেলে, অসংযমী, অজ্ঞান, দুর্বলচিত্তের হয় না। আমাদের মুখরক্ষা করো। আশীর্বাদ করি, সফল হও। সাধন মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল—হাসিমুখে জেলজীবন মানিয়া লইয়াছিল।" পিসীমার দেওয়া 'নিরঞ্জন' ছদ্মনামটির উল্লেখ নলিনীকিশোর গুহের লেখা 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থটির ২৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। (আজ ২০০5 সালে বানরিপাড়ার পিসীমা আর জীবিত নেই। তাঁর বিপ্লবীপুত্র সাধনও পরলোক গমন করেছেন ১৯৯৭ সালের ২০শে জানুয়ারি। পুত্রবধূ রেনুকা গুহঠাকুরতা জীবিত এবং পুরানো স্মৃতির ভারে জর্জরিতা)। ("কত অজানা মানুষ" পৃঃ ১০১)

"নববধূর উপস্থিত বুদ্ধি"

"১৯৩১ সালে বরিশাল শহর হইতে পুলিশের তাড়া খাইয়া শহরতলীর বিখ্যাত গ্রাম কাশীপুর—চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে হাজির হইয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় চায়—ফেরারী প্রফুল্ল সেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীও নববধূর ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া প্রথমে থতমত খান। নানা প্রশ্নবাণে বিব্রত প্রফুল্ল অবশেষে খোলাখুলি জানাইলেন, —আমি স্বদেশী, আমাকে আশ্রয় দিলে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ভগবান তুষ্ট হবেন। সামান্য একটু আশ্রয় চাই ২-৪ ঘণ্টার জন্য।

এদিকে পুলিশের গুপ্তচর উক্ত বাড়ীতে আসিয়া প্রশ্ন করে, কে নূতন এলো আপনাদের বাড়ী, নাম কি তার? আর তো কখনো দেখিনি এই চেহারা। গ্রাম্য গুপ্তচরকে দেখিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী ভয়ে সত্য কথাটি বলিয়া ফেলেন, বাপু। আমি তো চিনি না এঁকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘর হইতে ঘোমটা টানিয়া নববধূ কমলাদেবী অকুস্থলে আসিয়া সসম্ভ্রমে ফেরারী প্রফুল্লকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করেন, একি, মিতুদা—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে চল। এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো ছোটবোনকে? —শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া আর গ্রাম্য গুপ্তচরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, মা, বলে দিন ওঁকে, —ইনি আমার মাসতুতো দাদা, মাস্টারী করে গাভা হাইস্কুলে।" (সেই নববধূ কমলাদেবী আজ অশীতিপর বৃদ্ধা) ['কত অজানা মানুষ' পৃঃ ১০২]

এই ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অবিসংবাদী নেতা 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের জীবনের একটি ঘটনার সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। একবার মাস্টারদা পলাতক অবস্থায় চট্টগ্রামে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছেন। সময় তখন সন্ধ্যা। গ্রাম বাংলায় তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেওয়ার রেওয়াজ। এখনও এই রেওয়াজ আছে। হঠাৎ তিনি দেখেন এক বৃদ্ধা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম করার সময় বিড়বিড় করে বলছেন, "ভগবান, সূর্য সেনকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করো।" গ্রাম্য এই বৃদ্ধা নিজের পরিবারের কল্যাণ কামনা না করে ঈশ্বরের কাছে মাস্টারদার মঙ্গল কামনা করেছেন। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ দেয় মহিলারাও বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা করতেন এবং নানাভাবে সহায়তা করতেন। (...অবিস্মরণীয় পৃঃ ৩৬৭)

আবার অন্য ঘটনা প্রফুল্লকুমারের কাছে শোনা, একদিন কুমিল্লায় দলের কাজে প্রখর রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সম্পর্কিত এক মাসীর বাড়ীতে এক গ্লাস জলের জন্য যান। সাইকেল থেকে নেমে জল খেতে যাবেন হঠাৎ মেসোমশাইয়ের প্রবেশ। বললেন "বাবা, কেউ দেখলে তোমার জন্য আমাদের তো হাতে হাতকড়া পড়বে।" এই কথা শুনে প্রফুল্লকুমারও জল না খেয়ে পত্রপাঠ সেই স্থান থেকে বিদায় নেন।

পুলিশেব জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে ভীত মানুষজন বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তো নয়ই, জল পর্যন্ত দিতে ভয় পেত। (আত্মীয়স্বজন যে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ভয় পেত সে কথার উল্লেখ পরবর্তী সময়ে প্রফুল্লকুমারের 'জেলের খাতা' থেকে পাওয়া যায়।)

প্রফুল্লকুমারের বিপ্লবী জীবনের বোন কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনা ঘটনাটি এইরকম—একবার প্রফুল্লকুমার বরিশাল জেলার এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। হঠাৎ জ্বরে সেই পরিবারের সব সদস্য অসুস্থ। গৃহদেবতা নারায়ণের শালগ্রাম শিলা অস্নাত ও অভুক্ত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রফুল্লকুমারের পৈতা ছিল। তাঁকে ব্রাহ্মণ মনে করে বাড়ীর বয়স্করা গৃহদেবতার পূজা করতে অনুরোধ করেন। প্রফুল্লকুমার নিরুপায় হয়ে প্রথমে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেশমাতৃকার কাজে এই মিথ্যাচার করতে হচ্ছে বলে শালগ্রাম শিলার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে গৃহদেবতার পূজা সম্পন্ন করেন।

Terrorism in Bengal Vol II তে (পৃঃ ১১২৬তে) পাওয়া যায় যে ১৯৩৪ সালে অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে রায়সাহেব প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস জানান যে ত্রিপুরা জেলার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৭৫ জন। দলের নীতি ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সদস্য সংগ্রহ, তহবিলে অর্থের যোগান বাড়ান, ডাকাতি করে অস্ত্রসংগ্রহ এবং গহনা চুরির মাধ্যমে তহবিল বাড়ান। তাছাড়াও ছিল ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী হত্যার পরিকল্পনা। (ঐ বইয়ের পৃঃ ১১২৭)তে পাওয়া যায় যে অনুশীলনের দৃঢ় ভিত্তি ছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং ত্রিপুরা জেলায়। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজিত রায়, প্রফুল্ল সেন এবং পারুল মুখার্জি তখনও পলাতক ছিলেন।

Terrorism in Bengal Vol II পৃ. ১১৩০-১১৩১ তে ত্রিপুরা জেলার সংগঠন সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় কমিটি সুকুমার চক্রবর্তীকে ত্রিপুরা জেলার অনুশীলনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠায় কিন্তু সুকুমার চক্রবর্তী ফরিদপুর থেকে রামকৃষ্ণপুরে আসতেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। এর ফলে ত্রিপুরা কিছুকাল কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। ২০শে জানুয়ারি ১৯৩৫এ 'কুখ্যাত' পলাতক পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং পারুল মুখার্জী টিটাগড় আস্তানা থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। দেবপ্রসাদ সেন গ্রেফতার হন ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে। প্রফুল্ল সেন (ত্রিপুরা) খড়দহ পুলিশ স্টেশনের সুখচর থেকে গ্রেফতার হন ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৫। এই গ্রেফতার কেন্দ্রীয় কমিটির উপর তীব্র আঘাত হানে। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই জেলা থেকে আর উল্লেখযোগ্য নেতা পাঠানো সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে পুলিশ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। "রাজার বিরুদ্ধে

যুদ্ধের আয়োজন"—এই অভিযোগে আটত্রিশ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

এই বিপ্লবীদের কয়েকজন (যাঁরা বিভিন্ন জেল থেকে পালিয়ে ছিলেন) টিটাগড়ে একত্র হন। টিটাগড়ে কয়েকটি বাড়ীতে এই বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট করা ছিল। এই বাড়ীগুলির গোপন নম্বর দেওয়া ছিল এবং নিয়মকানুনও পূর্বাপেক্ষা কঠোর ছিল। যে বাড়ীতে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী, পারুল মুখার্জী প্রমুখ থাকতেন বাড়ীটি ছিল নির্জন এবং বোমা তৈরির পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু কোন মেয়ে ছাড়া বাড়ীভাড়া পাওয়া যাবে না। তাই বরিশাল সংগঠন থেকে প্রফুল্লকুমার পারুল মুখার্জীকে এখানে নিয়ে আসেন। তিনি নিজে এখানে না থেকে টিটাগড় স্টেশনের থেকে কিছু দূরে বেলঘরিয়ায় অন্য একটি বাড়ীতে থাকতেন। সঙ্গে থাকত সুধাংশু দত্ত নামে একটি অল্পবয়সী নিয়মনিষ্ঠ কর্মী। বাড়ীতে ঢোকার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিল। বাড়ীর অদূরে একটি দেওয়ালে 'Sunday 4' লেখা থাকলে বুঝতে হবে যে বাড়ীতে ঢোকা নিরাপদ। রোজ সকালে এটা লেখা হত। বিপ্লবী যুগল এই সাংকেতিক চিহ্নের সাথে পরিচিত ছিলেন।[৩৭]

দেবপ্রসাদ সেনের গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" তাঁর ধরা পড়ার যে ঘটনা লেখা আছে তাতে দেখা যায় ১৯৩৪ ইং শীত পড়ছে। গরম কোট গায়ে চাপিয়ে নিত্যদিনের মত টিফিন খেয়ে তিনজন পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পাল ও দেবপ্রসাদ সেন আস্তানা থেকে বের হয়েছেন। সঙ্গে বাহন ছিল দুখানা সাইকেল। ঠিক হল তিনজন টিটাগড় থেকে দক্ষিণেশ্বর চলে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবেন। দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁরা পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছন। কথা ছিল সেখানে আসবেন সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর বিপদের সম্ভাবনা দেখে পূর্ণানন্দবাবু দেবপ্রসাদকে নির্দেশ দেন বেলঘরিয়া আস্তানায় যাওয়ার। প্রীতি পুরকায়স্থ কেন আস্তানা গুটিয়ে চলে যায়নি সেই সংবাদ নিয়ে আসতে বলেন। বিপদের কথা জানানো হলেও তিনি দেবপ্রসাদকে সেখানে পাঠান। এ বিষয়ে দেবপ্রসাদের নিজস্ব জবানবন্দী "এ ভুল তিনি কেন করেছিলেন সে উত্তর আমি কোনদিনই পাইনি। কারণ আমি সত্যই সে সময় ছিলাম দলের সংযোগরক্ষাকারী। আমার উপর দায়িত্ব রয়েছে ৬টি আস্তানার দেখাশুনা করার তাছাড়া গোপন যোগসূত্রের অনেক ঠিকানা সম্বলিত ডাইরি।" ["স্মৃতির আলোয়" পৃ. ৩৯]

বেলঘরিয়া বাসায় ঢুকে দেবপ্রসাদ দেখেন সব দিক নীরব। প্রীতিকে ডেকেও কোন উত্তর পান না। প্রথম দরজায় ধাক্কা দিয়ে বুঝলেন প্রীতি নেই। সে ধরা পড়ে গেছে। পুলিশ ঘরের ভিতর লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে। ঘরে প্রবেশমাত্র তারা সর্বশক্তি দিয়ে দেবপ্রসাদকে গ্রেফতার করে।[৩৮]

পঞ্চম অধ্যায়

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা একই মামলার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাটিকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরিপূরক (supplementary) মোকদ্দমা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উভয় মোকদ্দমারই লক্ষ্য এক এবং দুটি মোকদ্দমাই অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সারা ভারতব্যাপী জাল বিস্তার করে অসংখ্য গ্রেফতার ও তল্লাসীর পরে প্রায় ৫০০ বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক করে। কিন্তু এই ধরপাকড়ের মধ্যেই ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি। শাসকবর্গের শান্তি বিঘ্নিত করে আবার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড দানা বেঁধে ওঠে।[৩৯] টিটাগড়ই এই কর্মকাণ্ডের প্রধান কার্যালয় ছিল—এই বিবেচনায় ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মোকর্দ্দমা "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।[৪০]

"আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলছিল অনুশীলন সমিতির পলাতক তরুণ বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্থানে দল গঠনের কাজ চালাচ্ছিল।"[৪১] দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ধরা পড়ার (১৯৩৪ সালে ৩০শে ডিসেম্বর) কয়েকদিন পরে ১৯৩৫ ইং সালের ১৬ই জানুয়ারি প্রফুল্লকুমার ধরা পড়েন পানিহাটি সুখচর খেলার মাঠে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রফুল্লকুমার টিটাগড়ের বাড়ীতে না থেকে থাকতেন বেলঘরিয়ায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর কর্মচারিদের একটি মেসে। তাঁর গ্রেপ্তার খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠে খেলা শেষের পর কলকাতার কর্মীদের সাথে অর্গানাইজেশনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। সেই মতো প্রফুল্লকুমার নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত মাঠে উপস্থিত হন। তিনি সান্ধ্য ভ্রমণের ছলে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটছিলেন। পুলিশ কিন্তু পূর্বেই তাঁর সেখানে যাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি মাঠে পায়চারি করে পরিচিত ছেলেদের খুঁজছিলেন। হঠাৎ টের পেলেন দুজন অপরিচিত লোক তাঁর পেছন পেছন আসছে। ক্রমাগত ঐ ব্যক্তি দুজন

প্রফুল্লকুমারের ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে পাশে চলতে আরম্ভ করে। তিনি ওদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টায় জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন। অপরিচিত ব্যাক্তিরা দুজন দুপাশ থেকে প্রফুল্লকুমারের দুই হাত চেপে ধরে। প্রফুল্লকুমার শারীরিক দিক দিয়ে খুব সবল ছিলেন। নিয়মিত মুগুর ভাজা, ব্যায়ামবীর শক্তপোক্ত মানুষ, তিনি ওদের ঘুষি মেরে পালাবার চেষ্টা করেন। হঠাৎ তিনটে চারটে বাঁশী বেজে ওঠে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর সহায়তায় পুলিশ গোটা মাঠ ঘিরে রেখেছিল 'পাকড়ো। পাকড়ো। ডাকু হ্যায়' রবে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত বাহিনী প্রফুল্লকুমারকে ঘিরে ধরে। তবু ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তিনি ওদের হাতছাড়া হয়ে দৌড়তে শুরু করেন। পালোয়ান প্রফুল্লকুমারের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজসাধ্য ছিল না। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক একটা মোটা দড়ি প্রফুল্লকুমারের সামনে ফেলে দিয়ে তাঁর গতিরোধ করে। গ্রামরক্ষী বাহিনী ও তাদের নেতা পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তারা পুলিশকে সহায়তা করে। গ্রেফতারের সময় প্রফুল্লকুমারের বয়স ছিল ঊনত্রিশ (২৯) বছর। (দৌড়বীর All Bengal Walking Race-এ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছিলেন প্রফুল্লকুমার। বিপ্লবী দেবপ্রসাদ সেন অন্যত্র তাঁর হাঁটার গতির উল্লেখ করেছেন)। তারাপদ লাহিড়ী তাঁর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ইতিহাসে" পৃঃ ১৭৪-১৭৫তে প্রফুল্লকুমারকে গ্রেফতার করার ইতিহাস বিশদে বিবৃত করেছেন।

"Terrorism in Bengal" Vol VI পৃ. ১২৬১-তে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৫ পানিহাটি, সুখচর পুলিশ স্টেশন, খড়দহ জেলা ২৪ পরগনা থেকে গ্রামরক্ষী বাহিনী প্রফুল্ল সেনকে গ্রেফতার করে। ঐ সময় প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে এক যুবক ছিলেন যিনি গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন। পুলিশ প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেয় এক লেফাফায় মোড়া ছয়টি বাংলায় লেখা সন্দেহজনক চিঠি। লেফাফার উপর লেখা ছিল বসন্তকুমার দত্ত টিম্বার মার্চেন্ট। কিন্তু প্রফুল্ল সেন এই বিষয়ে কোন কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করেন। হস্তলিপি বিশারদের মতে এই চিঠিগুলির হাতের লেখা ছিল প্রফুল্ল সেনেরই।

প্রফুল্ল সেনের গ্রেফতারের পর টিটাগড় গোয়ালপাড়া অঞ্চলের (যেখানে প্রফুল্ল সেন গ্রেফতার হন সেখান থেকে সাত মাইল দূরে) একটি বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে দুই বিপ্লবী শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী এবং পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বাড়ীটির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজা খোলেন মিস্ পারুল মুখার্জী। তিনি অনেক কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হন। ঐ বাড়ী তল্লাসী চালিয়ে কিছু জিনিস পাওয়া যায়—

(১) বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্য এবং ধূম্রজাল তৈরির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

(২) বোমা তৈরির নকশা (diagram of bombs)।

(৩) টাইপ করা কাগজ যাতে বিস্ফোরক প্রস্তুতের নির্দেশ ছিল।

(৪) একটি বিভিন্ন নাম সম্বলিত "where is it" নোটবই।

(৫) কিছু নাম ঠিকানা সম্বলিত কাগজ এবং কিছু আগুন পোড়া কাগজ।

(৬) রহস্যজনক চিঠি।

(৭) বিস্ফোরকের ওপর বই।

(৮) সন্দেহজনক লেখা।

(৯) ছদ্মবেশ ধারণের জিনিসপত্র।

বেলঘরিয়াতে যেসব কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে পুলিশ বলপূর্বক যেসব কাগজপত্র নিয়ে নেয় তা থেকে বাংলা, বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের ৪০০জন বিপ্লবীর নাম এবং বিভিন্ন ঠিকানা তাদের হাতে পৌঁছায়।

১৯৩৫ সালের ২৩শে জানুয়ারি বরিশাল থেকে ফরিদপুরের সন্তোষকুমার সেনকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে স্বীকারোক্তি দেন তা থেকে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায়। এই ষড়যন্ত্রের পরিধি বাংলার বিভিন্ন জেলা প্রধানত বরিশাল, ফরিদপুর, আসাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়ানো ছিল। সন্তোষ সেনের মতে প্রভাত চক্রবর্তী এবং অন্যান্য নেতারা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে (Inter-provincial conspiracy) যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার হলে প্রফুল্ল সেনই গুপ্ত সমিতির প্রধান বুদ্ধিদাতা "principal brain" (Terrorism in Bengal Vol-VI p. 1263) হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলেন। তিনি হাজিগঞ্জ (ত্রিপুরা) ডাকাতির কথা বলেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ আন্তঃপ্রাদেশিক মামলা চালানোর উদ্দেশ্যে এবং কিছু অংশ অস্ত্র কেনার উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে এই তথ্য ও তার কাছ থেকে জানা যায়। সন্তোষ সেন আরও বলেন যে প্রফুল্ল সেন বরিশাল এবং ফরিদপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দলের হয়ে সভা চালাতেন। প্রসঙ্গতঃ এই আলোচনা সভার উল্লেখ পূর্বে দেবপ্রসাদ সেনের "স্মৃতির আলো"তেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে দলের হাতে কিছু রিভলবার এবং পিস্তল রয়েছে এবং টিটাগড় থেকে উদ্ধার হওয়া স্যাভেজ অটোমেটিক পিস্তলটি তিনি সনাক্ত করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে প্রফুল্ল সেনের পরামর্শেই তিনি অপর দুই ফেরারী সীতানাথ দে এবং পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বেলঘরিয়া আসেন।

সন্তোষ সেন তার স্বীকারোক্তিতে আরও উল্লেখ করেন যে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে

সুধাংশু বিমল দত্ত (এই সুধাংশু দত্তের নামের উল্লেখ প্রফুল্ল সেন তাঁর বেলঘরিয়া আস্তানায় অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে করেছেন) নামে অপর এক যুবক খুলনা জেলার রাজপতের বিজয় গোপাল বসুর বাড়ী যান এবং বিজয়বাবুর স্ত্রী চারুবালা দেবীর হাতে একটি পুঁটুলী রাখতে দেন। বিজয়বাবুর বরিশালের বাড়ীতে প্রফুল্ল সেন মিস্ পারুল মুখার্জীকে কিছুদিনের জন্য রাখার ব্যবস্থা করেন। যে পুঁটুলী তিনি বিজয়বাবুর স্ত্রীকে রাখতে দেন তাতে ছিল কার্তুজ ভরা একটি অস্ত্র।

আরও যা খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে ষড়যন্ত্রকারীরা ভাটপাড়া, বেলঘরিয়া, রিষড়া, বালী, টিটাগড়, খিদিরপুর, খড়দহ, উল্টাডাঙ্গা, শোভাবাজার অঞ্চলে আস্তানা বা আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় সভাগুলি বরিশাল এবং ফরিদপুরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডাকা হত। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত যখন ধরা পড়েন তার পরবর্তী সময়ে প্রফুল্ল সেনই দলকে সংগঠিত করেন ("Prafulla Sen was organising the Party")।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল এবং সীতানাথ দে ১৯৩৪ এর ২৪ শে জুলাই আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পলায়ন করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ Bengal Criminal Law Amendment Act অনুযায়ী গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন।

(1) Miss Parul Mukherjee (কুমিল্লা)—এপ্রিল ১৯৩২

(2) Prafulla Sen (ত্রিপুরা)—২রা আগস্ট ১৯৩৪

(3) Deba Prasad Sengupta (ফরিদপুর এবং আগরতলা)—এপ্রিল ১৯৩২। কিন্তু পুলিশ এদের গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছিল।

বিপ্লবীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন, হরেন মুন্সী এবং প্রফুল্ল সেনের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা চিঠি, বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য, সন্তোষ কুমার সেন ও বিজয়কৃষ্ণ পাল চৌধুরীর দেওয়া স্বীকারোক্তি বিভিন্ন স্থানে সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রভৃতি থেকে পুলিশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পায়।

ফলে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি মামলা পুলিশ রুজু করে।

"The Anushilan Revolted Group was concerned in this case (File 1244/35)

Terrorism in Bengal vol. vi, p. 1260
Serial No : 831
Yearly No : 13
Date : 20th January 1935

Place : Goalpara, Police Station–Tittagarh

District : 24 Parganas

Nature of Crime : Recovery of arms and Tittagarh conspiracy case.

"The recovery of arms, ciphers, letters of Haren Munshi, letters found with Prafulla Sen, increminating documents, different statements and confessions, evidence of suspicious associations at difference places led to the conclusion that there was a wide spread conspiracy to wage war and to deprive His Majesty, the king of sovereignty of British India as contemplated in section 121A, Indian Penal Code. [Terrorism in Bengal vol-vi, p. 1264]

প্রফুল্লকুমার তাঁর 'আত্মকথায়' বলেছেন তিনি ধরা পড়ার পর খড়দহ লকআপে চোদ্দদিন ছিলেন। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালা থানায়। তাঁর জামাকাপড় হাতঘড়ি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই পুলিশ নিয়ে নেয়। (পরে মামলা শেষে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে যখন জেলে যান অর্থাৎ ২৪.৮.৩৮ তারিখে তখন Jail Godown-এ যে জিনিসগুলি জমা দেওয়া হয় প্রফুল্লকুমারের জেলের খাতায় এ সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিসের একটি তালিকা রয়েছে)।

1. One Gold ring engraved with Mina.
2. One Matchless wrist watch West-End watch co. make.
3. Two leather money bags containing Rs. 6/-, 10/-.
4. One fountain pen F.N.Gupta make taken P. Sen 24.8.37.
5. One electric torch–light & one flask.
6. One compass.
7. One leather belt.
8. One pen & pencil (combined).
9. A bunch of key in a ring.
10. Two keys with a string.
11. Safety pin.
12. Dices of cards + inkpots.
18. Time table.
19. Ex khatas.
20. Almanacs two/letters inkpots, paper, cards, wrapper, cloth shirt.

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় এই সমস্ত জিনিসের হদিশ আর পাওয়া যায়নি।

প্রফুল্লকুমারকে গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে তাঁর পরিচয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। তিনিও বিনাযুদ্ধে হার মানার পাত্র ছিলেন না। পুলিশ তাঁর পলায়নের কারণ জানতে চায় কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা বাড়ায়। নির্যাতনের ফলে প্রফুল্লকুমারের মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে ফুলে ঢোল হয়। পুলিশ কিছুতেই এই বিপ্লবীর পরিচয় পায় না। I.B. পশ্চিমবঙ্গ শাখা নানা চর, উপচর লাগিয়েও তিন চারদিন এই বিপ্লবীর পরিচয় ঠিক করতে পারেনি। ঘটনাচক্রে কুমিল্লার কুমুদ বিশ্বাসের ভাই থানায় আসেন। তিনি দেখে বলেন যে, "এতো মনে হচ্ছে আমাদের কুমিল্লার প্রফুল্ল সেন।" খবর পেয়ে I.B. Department-এর head নলিনী মজুমদার সদলবলে এসে আধঘণ্টা পুলিশের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রফুল্ল কুমারের সাথে দেখা করতে এলেন। লকআপে প্রফুল্লকুমার তখন ধরা পড়ার জন্য বিষাদগ্রস্থ। তিনি প্রথমে 'প্রফুল্লবাবু! প্রফুল্লবাবু!' বলে ডাকেন কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে খানিক পর্যবেক্ষণ করে বলেন 'Eureka'। "প্রফুল্লবাবু আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। ধরা পড়ে গেছেন।" প্রফুল্লকুমার সচকিত হয়ে তাকালেন। প্রফুল্লকুমারের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। কোন সমস্যায় পড়লে দুই ভুরুর মাঝখানের কপাল টিপতেন। পুলিশের কাছে এই মুদ্রাদোষটি record করা ছিল। অথচ দলের কোন বন্ধু এর আগে প্রফুল্লকুমারের এই মুদ্রাদোষটি খেয়াল করেন নি বা তাঁকে সচেতন করেন নি। তিনি নলিনী মজুমদারের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে মনে মনে তারিফ জানালেন।[৪২] এই নলিনী মজুমদারের নাম 'বাংলায় বিপ্লববাদ' নামক বইটিতে সেই যুগের প্রখ্যাত লেখক নলিনীকিশোর গুহ উল্লেখ করেছেন।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তক থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রারম্ভে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। কাগজপত্র, ঠিকানা এবং অন্যান্য নথি থেকে জানা যায় যে কর্মীদের যোগাযোগ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সাথে ছিল। বেলঘরিয়া ও টিটাগড়কে কেন্দ্র করে এক মামলার পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টায় ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। "To wage war against king Emperor"। "রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।" এই ছিল তাদের অভিযোগ। মন্মথ গুপ্ত ছিলেন পুলিশের একজন দক্ষ কারিগর। তিনি ঝাড়াই বাছাই করে অবশেষে ৩১জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়ে চার্জশীট দাখিল করেন।[৪৩]

Terrorism in Bengal Vol VI-তে পাওয়া যায়—"Accordingly the following 31 persons were placed on trial before a special tribunal and trial commenced on the 16th November 1935. When Sita Nath

De was absconding (He was subsequently arrested at Tippera in May, 1936). Of these accused persons (30) Santosh Sen (31) and Bijoy Krishna Palchoudhury turned approvers and they were tendered pardon."

কোর্টে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় ১৯৩৫ এর ১৬ই নভেম্বর। প্রফুল্লকুমার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ১৯৩৫-এর ১৬ই জানুয়ারি। অর্থাৎ দীর্ঘ দশমাস পর সিনিয়র আই.সি.এস. মিঃ এইচ.জি.এস বিভারের নেতৃত্বে এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে এই বিচার শুরু হয়। বিভার ছাড়া ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য ছিলেন আই.সি.এস মি.কে.সি. দাশগুপ্ত এবং রায়বাহাদুর এন.কে.বসু। সরকাব পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন জে.সি.মুখার্জী, বি.সি.নাগ প্রমুখ। এরপর দীর্ঘ দেড়বছর যাবৎ দিনের পর দিন বিচার চলতে থাকে।[৪৩]

দেবপ্রসাদ সেন তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আঁলোয়" উল্লেখ করেছেন যে বিপ্লবীদের পক্ষে উকিল যোগাড় করার সাধ্য ছিল না। পয়সা ছাড়া উকিল পাওয়া যায় না। যে কয়েকজন দেশপ্রেমিক উকিল বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার জে.সি.গুপ্ত (বর্তমানের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার সাধন গুপ্তর পিতা) শেখর বসু, অ্যাডভোকেট মন্মথ দাস, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সুকুমার দাশগুপ্ত ও শিশির মৈত্র। সওয়াল জবাব দেওয়ার সময় ব্যারিস্টার জে.সি.গুপ্ত আসতেন। তিনি আসলেই ট্রাইব্যুনালের জজরা নড়েচড়ে বসতেন।[৪৫]

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত রাজনৈতিক আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ নতুন নতুন ফন্দি বের করত। পূর্বে একজন বিপ্লবীর উপরে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ শারীরিক, নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাত। কিন্তু বিপ্লবীদের দৃঢ় মনোবল ভাঙা সহজ ছিলনা। ফলে পুলিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থই হত। পরবর্তী সময়ে বাংলার এই গোয়েন্দারা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে এক নরমপন্থার পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালাত। এই নরমপন্থার কাজ ছিল বিপ্লবীদের মধ্যে থেকে শিকার স্থির করে তার মনের উপর সুকৌশলে ক্রমাগত মানসিক চাপ সৃষ্টি করা। target-কে তার সঙ্গী সাথীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একা আটক রাখা হত। দিনের শেষে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত সুদক্ষ গোয়েন্দা অফিসার যেতেন interrogation-এর জন্য। তিনি বন্দীর পরম হিতৈষীরূপে নিজেকে স্থাপন করে বাড়ীর আত্মীয়স্বজনের কুশল কামনা করে আলাপ জমাতেন। বিপ্লবীদের চরিত্রের ত্যাগ ও সততার প্রশংসা করে, কখনও কখনও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী সম্বন্ধে গোপন খবর দেওয়ার ছলে সেই ব্যক্তির কোন কল্পিত অধঃপতনের মিথ্যা সংবাদ সুকৌশলে

পরিবেশন করতেন। আবার কখনও মোকদ্দমার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেন। কখনও সরকারের সাথে সহযোগিতা করলে বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ, সুখী ও সম্মানজনক জীবনের চিত্র তুলে ধরতেন। দিনে তিনচার ঘণ্টা এই মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চলত। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত আসামীদের মধ্যে বিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হরেণ মুন্সীর ওপর প্রথম এই প্রচেষ্টা চালান হয়। তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবার সাবজেলে। কিন্তু এই দৃঢ়চেতা বিপ্লবীর মনোবল ভাঙতে অসমর্থ হয়ে গোয়েন্দারা তাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফেরৎ পাঠায়। (অদম্য সাহসী এই বিপ্লবী অনশন চালানোর কালে force feeding-এর সময় সরকারি ডাক্তারের ভুলে ঢাকা জেলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে)।

তারপর গোয়েন্দাদের টার্গেট নির্দিষ্ট হয় বরিশাল ব্রজমোহন (সংক্ষেপে B.M.) কলেজের ছাত্র সন্তোষ সেন। তিনি প্রথমদিকে বিপ্লবীসুলভ মনোবলের পরিচয় দিলেও শেষপর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে রাজসাক্ষী হন এবং সঙ্গে বিজয় পালচৌধুরীও রাজসাক্ষী হয়ে আদালতে সাক্ষী দেয়[৪৬] এ সম্বন্ধে দেবপ্রসাদ সেন তাঁর গ্রন্থ "স্মৃতির আলোয়" লেখেন যে রাজসাক্ষী হয়ে সন্তোষ সেন বিপ্লবীদের ক্ষতি করেছিল সবচেয়ে বেশি। দল বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রকে বোমা প্রস্তুতের খুঁটিনাটি খবর জানবার সুযোগ করে দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক সন্তোষ নিজের তুচ্ছ সুখের জন্য দলের গোপন সব খবর ফাঁস করে দিয়েছিল।[৪৭]

"বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে পৃ. ২৯০-২৯১ বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ একরার বা স্বীকারোক্তি আদায় করাইবার পদ্ধতি (confession) সম্বন্ধে আলোচনাকালে লিখেছেন—ব্যক্তিবিশেষে পুলিশের স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রচেষ্টা বিভিন্নরূপে চলত। কোন অফিসার নির্যাতন চালাত আবার এক একজন এসে নিতান্ত ভদ্রভাবে নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রলোভন দেখাত। পরবর্তী কালে ১৯৩৬ সালেও ইহা দেখা যায়। টিটাগড় মামলার আসামী প্রফুল্ল সেন বেলঘরিয়া খেলার মাঠে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। প্রফুল্ল ঐদিন নিরস্ত্র ছিল। ধস্তাধস্তি হয়। থানায় নিয়া পুলিশ মারধোরও করে। সংবাদ পাইয়া আই.বি-র কর্তা নলিনী মজুমদার আসেন। তিনিই চিনিতে পারেন। প্রফুল্লর সম্মুখেই পুলিশদের গালাগালি করেন। "ছিঃ, ছিঃ, তোমরা কি পশু" ইত্যাদি। পরে প্রফুল্লকে বলেন, "আপনি স্কলার—ভাল ছাত্র, কত আপনার ভবিষ্যত। আপনি এক কাজ করুন...। এভাবে জীবন নষ্ট করিবেন না। আপনাকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি Ph.D. নিয়া আসুন। দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। এসব দল তো ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে ইত্যাদি।" এই আই.বি-র কর্তা নলিনী মজুমদারের উল্লেখ প্রফুল্লকুমার

তার 'আত্মকথায়' করেছেন।

প্রফুল্লকুমার undertrial prisoner হিসেবে ছিলেন তিন বছর। আবার এই সময় সীমার মধ্যে Bengal Criminal Law Amendment Act ভঙ্গ করার অপরাধে তিন বছর সাজা হয়।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অগ্রগতি :

প্রফুল্লকুমার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে ১৯৩৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর যে statement দেন (ধরা পড়ার প্রায় ১বছর ১১ মাস পর) তা নিচে হুবহু তুলে দেওয়া হল।

Statement of Sri Prafulla Kumar Sen before the special Tribunal Alipore on the 9th December, 1936.

"Your honour

I do not rise to speak in order to put in a lawyer's defence. There is my counsel whom I appointed to defend me. But I take the opportunity to speak out to your honour what I have been thinking for all this time, ...Since I was put under arrest and since my life and liberty became an object of gamble for the police. My whole family was penalised in anxiety and purse, while I was being made the leader of an alledged conspiracy (Tittagurh Conspiracy Case) to wage war against His Majesty's Government.

A conspirator must believe in a higher justice than that of the legal system under which he lives. Yet you find before your honour, the person accused of conspiracy and alleged to have waged war against the king Emperor (George the Fifth) taking defence in one of His Majesty's Court and asking for justice. Does it not seem inconsistent? —I do not know what your findings will be. But I beg to tell you that there is no inconsistency,—nay there is absolute inconsistency in it. I am no conspirator. I am therefore entitled to have it (justice) and I demand it.

Justice can be taken in two senses—lawfulness and fairness. I am no lawyer. I do not know how your honour will explain or interpret fairness. But if facts have got anything to do with it, I tell you once for all that instead of myself being the conspirator, I am the victim of a conspiracy by the police. It may sound something strange at first but if you kindly examine the evidences carefully

and look into them through the searchlight of truth, the whole drama which has been enacted before this court for all these months will appear in its real colour to the impartial, intelligent, upright commissioners of the case.

That which an individual would have been ashamed to do, —has been done by a body of people, —so dignified as to be called Public servants, the Guardian of Law and Order of the province—The Police.

I have suffered extra—judicially at their hands. I have my own experience and here also seen with my own eyes the stupid cruelties they inflict upon people in order to terrorise them to speak and to do as they want. I have seen them torturing physically and mentally, using alternately threats and lures, to turn a person witness and to tutor him to give false evidence in support of a fabricated story, not so much for the defence of the realm (kingdom), but for the jurisdiction of the existence of an abnormal atmosphere in the country, in which their services, emoluments and other extra-ordinary privileges and benefits may be continued indefinitely. They neither serve the Government nor the people of this country; they misrepresent both for their own ends. I do not know at what extremity the selfish cruelty of these people will stop. Already the doors of justice have been shut by some special enactments (laws), and even in cases in which the portals (doors) of the Court are still open, they have tried to bar the doors with the gigantic strength of their own shadows, so that the light of truth may not enter there.

I would not have been sorry if they charged me rightly. Earl Haig once told his vilifiers (those who speak ill of), "I do not mind what you say of me, provided you give the facts." My grievance against the Police is that they do not give the facts. I admit myself that I have one fault. I have this in common with every honest man in every country—that I love my country. I love liberty. I want to see my country men taking their legitimate (share) part in the Government of the country to shape the destiny of this big nation. Is there any thing wrong in it? Nations all over the world have it. But I do not want for my country the type of Nationalism which Europe has—the nationalism of gain or less, the nationalism is

nurtured on the hatred of other nations—an aggressive, selfish and commercial nationalism. I have for my ideal the concept of Deshbandu's Nationalism : the right of self determination, self-realisation and self-expression.

If I can be accused of any activities, I can be charged for the propagation of this ideal only. I went from village to village from 1928 to preach the gospel of this nationalism. I went among the masses to rouse the consciousness of the economic problems around them. I lectured to them on the agricultural, social and economic problems and explained my subjects through lantern slides. At times no doubt I was critical of the present Government when I found the Government directly responsible for any cause of their sufferings. But if they think, these ideals are far more fatal things than guns, cannons and tanks, then I have nothing to say.

That was the only offence I gave to the Police. The Police would have surely dealt me in a different manner in the different atmosphere. But in the present atmosphere in the country, they found a more handy weapon in the Conspiracy Phobia. By this they will not only be able to undo my work in the villages, but will have an opportunity to drain huge sums to their benefit from the coffers of a misinformed and terror sticken Government. The money which could be better utilised for nation building works and for the amelioration of the crying needs of the poor in the country is thus being diverted to fill up the pockets of a huge army of unnecessary police. I had no desire to comment upon this. But it appeared to me such a painful truth that I could not refrain from speaking out what I felt.

I do not know how long they will carry on like this and where they will end. But I am apprehensive of the results. No slightest action fails of its effects. The casting of a pebble in the atmosphere the Scientists say—alters the centre of gravity of the earth and the effect goes on producing other effects for ever. If the Scientists are right, what will be the effect of these bad, selfish and cruel things, both on the Government and on the people of this country? It is too big a problem for me to think. But I have already seen how they have caused untold miseries and suffering in innumerable

homes and affected the lives of many. There is nothing so terrible as activity without insight.

They are like those people in Carlyle's description who imagine that because judgement of an evil thing is delayed, that is no justice. Let me give the reply in Carlyle's words—judgement of an evil thing is sometimes delayed, some—day or two some country or two, but it is as sure as life, as sure as death!

Yet it is a tragic thing, when the gigantic machinery of a Government is misdirected and utilised to pronounce ship-wreck on man.

At last I appeal to that high sense of justice (which is an emblem of divinity itself), which no king can ever corrupt and no power can ever influence. I have got one security and that is the security of my conscience. Standing at the bar of this court, I want to declare solemnly, —I am not guilty.

Civilization is an edifice (large structure) founded on Righteousness and Justice.

Let there be Justice
(Bande-Mataram)
Sd/- Praphulla Kumar Sen
9.12.1936

প্রফুল্লকুমার এইভাবে এই বানানে নিজের নাম সই করতেন।

প্রফুল্লকুমারের দেওয়া এই জবানবন্দীতে তিনি যে ১৯২৮ সাল থেকে অনুশীলনের হয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলেন এই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। আলোক চিত্রের সাহায্যে তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরতেন তাও জানিয়েছেন। পূর্বে শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও শ্রীনলিনীকিশোর গুহ পুলিশের দ্বারা বিপ্লবীদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টার কথা তাঁদের লেখা বইতে লিখেছেন। প্রফুল্লকুমারও 'using alternately threats and lures'-এর উল্লেখ করেছেন। এই জবানবন্দীর প্রতিটি ছত্রে দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও বন্ধনের উল্লেখ তিনি করেছেন সুন্দর ইংরেজি শব্দচয়নের দ্বারা "I love my country. I love liberty. I want to see my countrymen taking their legitimate part in the Government." আবার পুলিশ যে তাঁকে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার একজন নেতা হিসেবে দেখিয়ে শাস্তি দিয়েছে তা বলেছেন "while I was being made the leader of an alleged conspiracy..." বৃদ্ধ পিতার কষ্টের ছবি

পাওয়া যায় "My whole family was penalised in anxiety and purse." প্রফুল্লকুমারকে গ্রেফতারের পর দীর্ঘদিন undertrial prisoner হিসেবে রাখা হয়েছিল—"the whole drama which has been enacted before this court for all these months."

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ৫০৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং ২০০০-এর কিছু বেশি দলিল একজিবিট হিসাবে দাখিল হয়।[৪৮]

যে ৩১জন আসামীকে এই মামলায় বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয় (১) পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত (২) **প্রফুল্লকুমার সেন** (৩) কুমারী পারুল মুখার্জী (৪) শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী (৫) ধনেশ ভট্টাচার্য (৬) দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি (৭) দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত (৮) শান্তিরঞ্জন সেন (৯) যজ্ঞেশ্বর দে (১০) সন্তোষকুমার সেন (১১) বিভূতি ভট্টাচার্য (১২) রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৩) বিজয়কৃষ্ণ পালচৌধুরী (১৪) মাখন কর (১৫) জগদীশ ঘটক (১৬) অজিতলাল মজুমদার (১৭) নিরঞ্জন ঘোষাল (১৮) নীরদ ব্যানার্জী (১৯) জীবনকৃষ্ণ ধূপী (২০) জগদীশ চক্রবর্তী (২১) সীতানাথ দে (ব্রহ্মচারী) (২২) কালীপদ ভট্টাচার্য (২৩) বীরেন্দ্রনাথ বসু (২৪) ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি (২৫) প্রীতিরঞ্জন দাসপুরকায়স্থ (২৬) দেবব্রত রায় (২৭) হরেন্দ্রনাথ মুন্সী (২৮) জুড়ান গাঙ্গুলী (২৯) সুধাংশু বিমল দত্ত (৩০) কার্তিক সেনাপতি (৩১) ধীরেন্দ্রনাথ ধর। [ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ইতিহাস পৃ. ১৭৭-১৭৮]

এই মামলার সময় সরকারি উকিল বলেন যে এই আসামীরা সকলেই 'অনুশীলন সমিতি' নামক বৈপ্লবিক সংগঠনের সভ্য। তাঁরা কলকাতা এবং জেলায় জেলায় বহুসংখ্যক গোপন 'শেলটার' তৈরি করেন, যেখানে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা আশ্রয় নিতেন। তাঁরা বক্তৃতা দেওয়া, বই, ইস্তাহার বিলি প্রভৃতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে যুবকদের মন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিষাক্ত করে তুলতেন। অপরদিকে রাজনৈতিক হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের মাধ্যমে শহীদ হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে দেশবাসীর মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতেন।[৪৯]

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার রায়দান ঃ

১৯৩৭ এর ২৭ শে এপ্রিল বিচারকগণ "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার রায়" ঘোষণা করেন।

Terrorism in Bengal Vol VI p. 1264-এ পাওয়া যায়..."of the remaining 29 persons, 12 were acquitted and 17 convicted on the

27th April, 1937 under section 121A, Indian Penal Code and sentenced to various terms of imprisonment as shown against each:

(2) **Prafulla Kumar Sen—Transportation for 12 years.**

The appeals of all 16 convicted accused (Harendra Munshi having died in jail during the disposal of the appeal) were dismissed by the Hon'ble High Court on the 9th May 1938.

প্রফুল্লকুমারের পিতা বহু খরচ করে উচ্চ আদালতে আপীল করেন। জেলে প্রফুল্লকুমারকে লেখা উকিলের চিঠিতে (যে চিঠির নকল পরবর্তী পর্যায়ে আছে) হরেন্দ্র মুন্সী ও কার্তিক সেনাপতির নাম উল্লেখ আছে।

Terrorism in Bengal Vol VI ছাড়াও "Terrorism in India", p. 63, নলিনীকিশোর গুহের বাংলায় বিপ্লববাদ পৃঃ ২৬৩, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর "জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম" পৃঃ ২১৮, তারাপদ লাহিড়ীর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ইতিহাস" পৃঃ ১৭৭-১৮১তে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

'জেলের খাতা'য় প্রফুল্লকুমারের লেখা একটি চিঠিতে তিনি ১৫ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন,—পরে যে দণ্ড ৩ বছর মুকুব হয়েছে সেকথাও লিখেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারাজীবন

প্রফুল্লকুমারের জেল জীবন তাঁর ধরা পড়ার সময়েই শুরু হয়েছিল (১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৫)। রায় ঘোষণার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর জেলে। প্রেসিডেন্সির পাশেই নতুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। এই জেলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাঁকে রাখা হয়। Conviction এর পর তাঁকে bomb ward-এ নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে সুভাষচন্দ্র বসু, জে.এম. সেনগুপ্ত, ডঃ রুইকার প্রমুখের সঙ্গে তিনি ছিলেন। সরকার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে নারাজ ছিল ফলে দাবি আদায়ের জন্য নিরস্ত্র বিপ্লবীরা শুরু করেছিলেন অনশন। (আলিপুর জেলের স্ট্যাম্প মারা খাতা এই জেলে প্রফুল্লকুমারের থাকার প্রামাণ্য একটি দলিল।)

নির্দিষ্ট yard-এ সিপাহী পরিবেষ্টিত হয়ে নতুন বস্ত্র পরে বিপ্লবীদের থাকতে হত। পরনে থাকত জাঙ্গিয়া, কুর্তা। প্রফুল্লকুমারের আলিপুর কারাগারে অবস্থান ছিল ১৪নং সেল।

প্রফুল্লকুমার সাজা বা দণ্ডভোগ সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ঃ

প্রফুল্লকুমারের বন্দীজীবন কিভাবে কেটেছিল তার একটি চিত্র নলিনীকিশোর গুহ 'বাংলায় বিপ্লববাদ'-এর পরিশিষ্ট পর্বে 'বন্দী জীবনে সংগ্রাম নিষ্ঠা' অধ্যায়ে দিয়েছেন—

"শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন"—[ছাপার ভুল হবে "প্রফুল্লকুমার"]

"২৫.২.৩৫ সাল হইতে ২২.১২.৩৮ সাল পর্যন্ত ৩৪ দফায় সাজা ভোগ করেন, সাজার উপরে সাজা। এমন কোন সাজা জেল কোডে নাই—যাহা প্রয়োগ করা হয় নাই। —হিংস্র আক্রোশে তাহা প্রয়োগ করিয়াও ইস্পাত-কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তা নোয়ান সম্ভব হয় নাই। বিপ্লবীর এই জয়, দৈহিক বলের নিশ্চয় নয়। মনোবল, আত্মিক বল বলিতে বাধা দেখি না।"[1]"

বিপ্লবীদের জেল জীবন অসহনীয় ছিল। জেলে বন্দীদের সাজার উপর আবার নতুন সাজা চাপান হত। সরকারের দুর্ব্যবহার, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা না দেওয়া, দৈনিক সংবাদপত্র না পাওয়া, রোগ চিকিৎসায় মারাত্মক অপ্রতুলতা—এগুলি তো

ছিলই, তাছাড়া অখাদ্য খাবার পরিবেশনের ফলে, অত্যাচারের কবলে পড়েও অকালে অনেকের প্রাণ ঝরে যায়।

জেলের আহারের যে নমুনা পাওয়া যায়—সকালে দিত লপ্‌সি (চাল, ডাল একত্রে সেদ্ধ), দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারী (নামমাত্র), তদুপরি নানা সাজায় বন্দীরা হত জর্জরিত।[৫১]

সাজার নমুনা—বন্দীদের ডাণ্ডাবেরী (হাতে ও পায়ে), স্ট্যান্ডিং হ্যাণ্ড ক্যাপ, নাইট হ্যাণ্ড ক্যাপ পরিয়ে রাখত। এছাড়া জেল কোডে নেই এরকম অনেক সাজাও বিপ্লবীদের দিত। প্রফুল্লকুমারকে জেলের আইন ভঙ্গ করার অপরাধে রাতে শোবার আগ পর্যন্ত fetter (পদশৃঙ্খল) পরিয়ে রাখা হত, আবার cross by fetters অবস্থায়, দীর্ঘদিন দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে প্রফুল্লকুমারকে পরবর্তী জীবনে পায়ে গেঁটে বাতের আক্রমণে কষ্ট পেতে হয়েছে। জেলের ডাক্তারের সাবধানবাণী "প্রফুল্লবাবু, পরবর্তী জীবনে এই জেদের ফলে কষ্ট পাবেন।" কঠোর শাস্তি বা ভবিষ্যৎ অসুস্থতা সম্বন্ধে সাবধানবাণী কোন কিছুই এই অদম্য জেদী বিপ্লবীকে তাঁর জেদ থেকে একচুল নড়াতে পারেনি। আলিপুর জেলে 'কারাসাথী' হিসেবে কতিপয় নাম (যা তিনি 'আত্মকথায়' দিয়েছেন) পাওয়া যায় তাঁরা হলেন সীতানাথ দে (আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত), রাধাবল্লভ গোপ (পরবর্তী জীবনে R.S.P নেতৃবৃন্দের একজন) জিতেন গুপ্ত, প্রভাত চক্রবর্তী (পরবর্তী জীবনে C.P.M দলের কোষাধ্যক্ষ), বিনয় চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী), নির্মল গুহঠাকুরতা, মনমোহন চক্রবর্তী (বেনারস, পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লকুমারের ছোট কন্যা পারমিতার শ্বশুর), জলধর পাল। আরও অনেকে ছিলেন যাঁদের নাম তিনি 'আত্মকথা'য় স্মরণ না করতে পারার জন্য আক্ষেপ করেছেন। শেষোক্ত তিনজন খুবই কমবয়েসী ছিলেন। কিন্তু কোন শাস্তি দিয়েই ব্রিটিশরা এই বিপ্লবীদের দমাতে পারেনি।

আলিপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারের চোদ্দ (১৪) নম্বর সেলে পায়ে ডাণ্ডাবেরী ও হাতে হাতকড়া পড়া অবস্থায় প্রফুল্লকুমার ছিলেন। তার উপর তিনি ও সীতানাথ দে উভয়ে কিছুদিন ছিলেন উলঙ্গ অবস্থায়। এ বিষয়ে নিজের "আত্মকথায়" তিনি বলেছেন "অবশ্যই কোন ন্যুড এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসেবে নয়।" এই উলঙ্গ থাকার কারণ ছিল ব্রিটিশ জেল কর্তৃপক্ষের অমানুষিক ও অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। আলিপুর কারাগারে কাপড়ের পরিবর্তে লঙ্কা রাখা চটের কাপড় এই বিপ্লবীদের পরতে দিত। এটি ছিল জেল কোডের বাইরের শাস্তির একটি নমুনা। লঙ্কা রাখা চটের সেই কাপড় পরলে সারা গা জ্বালা করত। তাই এই দুই বিপ্লবী উলঙ্গ থাকতেন। আই.জি. অব প্রিজন ব্রিটিশ সাহেব জেল পরিদর্শনে আসেন।

বিপ্লবীদের উলঙ্গ থাকার কারণ জেল সুপারকে জিজ্ঞেস করায় সে ইংরেজিতে পাগল বলে পরিচয় দেয়। (এই জেলসুপারের নাম ও সই প্রফুল্লকুমারের জেলের খাতায় আছে কিন্তু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি)। এই ঘটনার সময়কাল—১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর।

বিপ্লবী সীতানাথ দে (বিপ্লবীদের পাগল বলে অভিহিত করা) তা শুনতে পেয়ে প্রফুল্লকুমারকে ডাকেন। প্রফুল্লকুমার তখন আই.জি.কে ইংরাজীতে বলেন "জেল টিকিট পড়ে দেখ। তোমাদের ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন (European Civilization) কিরকম দেখে যাও। তোমার পা থেকে গলা পর্যন্ত পোষাক তৈরি করতে গিয়ে আমাদের কাপড়ে টান পড়েছে। তাই আমাদের চটের কাপড় দেওয়া হচ্ছে। তোমরা আমাদের কি অবস্থায় রেখেছ?" আই.জি. এইসব শুনে দেখে লজ্জায় লাল হয়ে চলে যান। এরপর আর কখনও বিপ্লবী বন্দীদের ঐরকম কাপড় পরতে দেওয়া হয়নি। [পরিশিষ্ট ১ ঃ আত্মকথা]

জেলখানায় সব কষ্টকেই বিপ্লবীরা হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। উলঙ্গ অবস্থায় থাকাকালীন ডিসেম্বরের শীতের হাত থেকে নিজেদের শরীর গরম করার জন্য গলা ছেড়ে গান গাইতেন। প্রফুল্লকুমার নিজেও লিখতে পারতেন। হাতকড়া নিয়ে লেখা ডাণ্ডাবেরীর গান তাঁর 'আত্মকথা'য় যা বলেছেন (এই লেখা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্যুভেনিরে প্রকাশিত হয়েছিল।)

'হাতকড়া নিয়ে লেখা ডাণ্ডাবেরীর গান'

লেখক ঃ প্রভু (প্রফুল্ল সেন) সুরকার ঃ দয়াময় (সীতানাথ দে)

স্থান ঃ আলিপুর কারাগারের ১৪ নম্বর সেল

সময় ঃ ১৯৩৬ এর ডিসেম্বর মাস

'প্রেয়সী'

(১)

শুনো গানটি আমার দয়াময়।

শীতে কাঁপি থরথরি

(তবু) মন-সুখে গান ধরি

ঘর্ম্ম ছোটে স্ফূর্তির চোটে

ছুটাই গানের স্রোত বেগময়।

(২)

আবেগ ওঠে কতো কি
কান্না হাসি হিঃ হিঃ হিঃ
খুশী মাফিক গেয়ে বেড়াই
আমি যে ভাই চিন্ময়।

(৩)

আপনমনে আপনি ভোলা
গানটা যে গাই প্রাণটা খোলা
সুর-তালের ধারিনে ধার
এ বিশ্ব প্রপঞ্চময়।

(৪)

গাইতে গিয়ে কভু ছুটি
তালে বেতালে নেচে উঠি
(খাই) লুটোপুটি ভূমে পরে
(জানি) মাটি খাঁটি "মা"—টিময়।

(৫)

(আমি) দিগম্বর থাকি ন্যাংটা
শীতে উদ্‌লা সারা ঠ্যাংটা
তাই ত্রিশূল হাতে ভস্ম মেখে
ঘুরতে সাধ হয় বিশ্বময়।

(৬)

হাতে কড়া পায়ে বেড়ী
তবু কী (ভাই) সে গান ছাড়ি
বাজিয়ে ডাণ্ডাবেরী তাড়াতাড়ি
ঝুমুর উঠাই মধুময়।

(৭)

রুনুঝুনু বাজে ওরা (ডাণ্ডাবেরী)
সাজি কানু মন-চোরা
বাঁকা হয়ে বেড়ী হাতে
লীলা খেলি সেলময়

(৮)
রাধা? আমার পায়ে বাঁধা
মানে বসে কতো কাঁদা
(আবেগে) রুনু ঝুনু নাচে সেও
আমি রাধার প্রেমময়।

(৯)
আমি তার সে আমার
শীতে সাথী কে আছে আর
দেহে বাঁধা আছে নিতি
প্রিয়া আমার দেহময়
শীতে ডাণ্ডাবেরী ঠাণ্ডা নয়
শুনো গানটি আমার দয়াময়।

"দুর্দিনের সাথী দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সীতানাথ দে (ব্রহ্মচারী) প্রফুল্ল সেনকে 'প্রভু' বলে ডাকতেন, প্রফুল্ল সীতানাথকে 'দয়াময়' বলে ডাকতেন।"

এই গানটির মধ্যে জেলের কষ্টের একটা ছবি আঁকা রয়েছে। ডাণ্ডাবেরী শীতে আরও ঠাণ্ডা হয়ে বিপ্লবীদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে কষ্ট দিত। cross by fetters হয়ে থাকার জন্য "বাঁকা হয়ে বেড়ী হাতে" সেলময় তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন।

জেলে অনশন সত্যাগ্রহ দৃঢ়তার সঙ্গে পালন ঃ

প্রফুল্লকুমার তার দীর্ঘ জেল জীবনে চারবার অনশনে সামিল হয়েছিলেন। এই অনশন ছিল যথাক্রমে ৪২দিন, ৫১দিন, ৩৮দিন এবং ৪৫দিন।[১১] এ বিষয়ে 'আত্মকথা'য় তিনি যে অভিমত পোষণ করেছেন তা হল "অবশ্যই এই দিনগুলি জেল রেকর্ডে উল্লেখ করা দিন। আমরা অনশন শুরু করার পর কয়েকদিন কেটে যেত কর্তাব্যক্তিদের কানে পৌঁছতে।"

জেলের অত্যাচারের প্রতিবাদে বন্দীরা সবাই একদিনে একযোগে অনশন শুরু করত, স্থির করা হত, একমাত্র ন্যুনতম দাবীর সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পেলে তবে অনশন প্রত্যাহার করা হবে। কেউ একা অনশন ভঙ্গ করবে না। শুরুর পূর্বে সাবধান করা হতো কিভাবে নিপীড়ণ আসতে পারে সে ব্যাপারে। জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে, নানা প্রলোভন দেখাবে। বন্দীরা শুধুমাত্র জলগ্রহণ করবে। অন্য খাবার নয়। চিকিৎসার চেষ্টা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবে। বিপ্লবীদের ন্যুনতম দাবীগুলি ছিল—নির্বাসিত বন্দীদের ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে ফিরিয়ে আনা এবং বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেওয়ার নিশ্চিত আশ্বাস সরকারকে দিতে

হবে।

এই সংগ্রামের রণক্ষেত্রে একসাথে সকলে লড়াই চালিয়েছিলেন। প্রথম পাঁচ ছয়দিন বন্দীরা প্রত্যেকে যে যার সেলে কখনও শুয়ে কখনও বা বসে সময় কাটাতেন। ক্ষুধার জ্বালা বড় তীব্র। কিন্তু সামনে আরও কঠিন দিন আসবে। সুতরাং ক্ষিদে সহ্য করতেই হবে। পিপাসায় শুধু জলগ্রহণ করতেন বিপ্লবীরা। ৬দিন পরে শুরু হত কারা কর্তৃপক্ষের অকথ্য অত্যাচার। জবরদস্তি করে বন্দীদের খাওয়ানোর চেষ্টা। জেলের ডাক্তার প্রতিটি সেলে বাহিনী নিয়ে হাজির হতেন। বন্দীদের ফোর্স ফিডিং করানো শুরু হত। কারণ বন্দীদের মরতে দেওয়া চলবে না। ডাক্তারের সঙ্গে থাকত মূর্তিমান দৈত্যের মতো শক্তিধর কয়েকজন ব্যক্তি। তারা জবরদস্তি শুরু করত। বিপ্লবীরা অপরদিকে দুর্বল শরীরে যথাসাধ্য প্রতিরোধ চালাতেন। শেষপর্যন্ত তাদের কাবু করে নাকে নল ঢুকিয়ে নিজেদের হিসেব মত একটি মিক্সচার নলের মধ্য দিয়ে ঢেলে দেওয়া হত। কাজ শেষ হলে তারা চলে যেত। শ্রান্ত, অবসন্ন বিপ্লবীরা পড়ে থাকতেন। সম্বিৎ ফিরে এলে তারা আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন যে কিছুতেই হার মানা হবে না।[৫৩] এইরকম জবরদস্তি করে খাওয়ানোর (force feeding) সময়ে প্রফুল্লকুমারের সামনের উপরের দিকের দুটি দাঁত ভেঙে যায়।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন এবং আলিপুর conviction এর পর বিপ্লবীদের বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি দেওয়া হত। সুদূর কুমিল্লা থেকে প্রফুল্লকুমারের পিতা শ্রী নবীনচন্দ্র সেনও আলিপুরে ছেলের সাথে দেখা করতে আসতেন। গ্রামের কোন লোক পুলিশের ঝামেলার ভয়ে এই বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করার সাহস পেত না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রামচন্দ্র শর্মা। প্রফুল্লকুমার তাঁর কথা 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রফুল্লকুমারের পিতার সঙ্গে আলিপুরে দেখা করতে আসতেন। এরপর যখন প্রফুল্লকুমারকে বিভিন্ন জেলে পাঠান হয় তখন সেইসব জেলেও তিনি প্রফুল্লকুমারের পিতার সঙ্গে যেতেন। প্রফুল্লকুমার জীবন সায়াহ্নে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর কথা স্মরণ করে বলেন, —"তিনি ছিলেন এককথায় আমার medicine of life"।

আলিপুর জেলে থাকার সময় প্রফুল্লকুমারের বাবার কাছ থেকে পাওয়া দু একটি চিঠি এখানে তুলে দেওয়া হল। এই চিঠিটিতে আত্মীয় স্বজনের বিমুখতার কারণে বাবার মর্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রী দুর্গা সহায়

ঘাশীগ্রাম
১৭ই শ্রাবণ

পরম কল্যানীয়,

বাবা আমি অনেকদিন যাবত তোমার কোন চিঠিপত্র না পাইয়া চিন্তিত আছি। আমার নিকট কেন পত্র লিখিতেছ না তাহার কারণ বুঝিলাম না। আমি কালিকাপুর থাকাকালীন সুহাসিনীর নিকট যে পত্র দিয়াছ তাহার মর্ম অবগত হইয়াছি। শ্রীমতি ও তোমার সেই পত্রের উত্তর দিয়াছে বোধহয় তুমি পাইয়াছ। তোমার কত টাকার দরকার হইবে এবং কবে নাগাত তাহা জানাইবা। আমি এই মাসে ১৩ তারিখ সোমবার বাড়ীতে আসিয়া তোমার বড়মার নামীয় এক পত্র দিয়াছ দেখিলাম। তাহারা কেহ যখন তোমাকে পত্র দেয় না তুমি তাঁহাদ্গিকে কেন পত্র দিয়া বিরক্ত করিতেছ। আমাকে এবং সুহাসিনীকে রীতিমত পত্র দিবা। আর মনে করিবা তোমার কেহই নাই। কবে তোমার মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। তাহা আমাকে জানাইবা। কলিকাতা হইতে আসিয়াছি পর হইতেই আমার শরীর খারাপ হইতেছে। কাশীনগরের জয়চন্দ্রের খুকিটী এই মাসের ৭-৮ তাং জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। আমি যেখানেই যাই আমার মনে শান্তি নাই। আমি আবার কলিকাতা যাইবার চেষ্টা পুনঃরায় করিব। তোমার মত কি জানাইবা। চৌধুরী বাড়ীর তোমার ঠাকুরদাদার অসুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল এখন একটু ভাল আছেন। তোমার বড়দিদি টাকা পাঠাইয়াছিল কিনা আমি জানিতে পারিলাম না। হিরণীর বিবাহ এখনও কোথাও ঠিক হয় নাই। সুসঙ্গিকে সুইশ পাড়া নাগেদের বাড়ীতে দিয়াছে। জামাই কি কাজ করে জানিনা। তোমার যখন যাহা দরকার হয় তোমার মামা মহেন্দ্রের নিকট চাহিয়া লইবা। তাহাকে বলিবা আমার নিকট যাহা খরচ হয় তাহার টাকার জন্য আসিলে পাঠাইব। রবির জ্বর। আর সকলে একপ্রকার আছে। ...বাড়ীর শ্রীশের অসুখ এখনও সারে নাই। অনেকদিন ভুগিতেছে। ইতি তোমার বাবা। বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দিবা।

[চিঠিতে Replied কথাটি পাওয়া যায়।]

Sreeman
Prafulla Kumar Sen
Undertrial Political
Prisoner no, 257
Alipore Central Jail
24 Parganas

[Stamp
Alipore Central Jail
Passed জেলারের সহি
Date 10/8]

উপরের পত্রটি থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। চিঠিটি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো। তারিখ ১৭ই শ্রাবণ (বাংলায়)। প্রফুল্লকুমার যে Alipore Central Jail-এ undertrial Political Prisoner হিসাবে বন্দী ছিলেন তার নম্বর ছিল ২৫৭। জেলারের স্ট্যাম্প ও সই রয়েছে passed কথাটি লেখা আছে। তিনি চিঠিটির উত্তর দিয়েছিলেন। Replied লেখা থেকে অনুমান করা যায়।

একমাত্র পুত্র জেলে বন্দী থাকার কারণে পিতার মনঃকষ্টের জীবন্ত দলিল এই চিঠি। বিপ্লবী পুত্রের সবরকম প্রয়োজনের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাকে একবার চোখের দেখা দেখে কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে পুনরায় অসুস্থ শরীরে দ্বিতীয়বার কলকাতা আসার জন্য মত জানতে চাইছেন। বারবার কলকাতা যাতায়াতের খরচ জোগাড় করা এবং মামলার খরচ চালানো বৃদ্ধ পিতার পক্ষে সহজ ছিল না। শরীরও তখন অশক্ত, চিঠিতে একথাও পরিস্কার যে শূন্যগৃহে তাঁর মন টিকতো না। তাই প্রায়ই কন্যা সুহাসিনীর কাছে গিয়ে থাকতেন। গ্রামের, পাশের গ্রামের প্রত্যেক আত্মীয় স্বজনের খুঁটিনাটি খবরও পোস্টকার্ডের স্বল্পপরিসরের মধ্যে লিখে পুত্রকে জানিয়েছেন। পুত্রের পত্রের জন্য তিনি কতটা উদগ্রীব তাও চিঠিটির মধ্যে থেকে জানা যায়।

তখনকার দিনে বিপ্লবীদের আত্মীয় পরিজনেরা পরিহার করে চলতেন। তা' যে পুলিশী ঝামেলার ভয়ে সেকথা প্রফুল্লকুমার 'আত্মপরিচয়ে' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্নেহশীল পিতার বুকে একমাত্র পুত্রের প্রতি অবজ্ঞা শেলের মতো বিঁধতো। তাই তিনি পুত্রকে আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লেখা থেকে বিরত থাকতে লিখেছেন।

"বড়দিদি টাকা পাঠাইয়াছিল কিনা আমি জানিতে পারিলাম না।" —উক্তিটির মধ্যে থেকে জানা যায় যে বড়দিদি প্রফুল্লকুমারকে নিয়মিত জেলে টাকা পাঠাতেন।

এই বড়দিদি প্রফুল্লকুমারের পিসতুতো বড়দি শিবসুন্দরী (তাঁর কথা প্রফুল্লকুমারের ফেরারী জীবনে উল্লেখ করা হয়েছে), পরবর্তী চিঠিতেও বড়দিদির সাহায্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই চিঠি থেকে আরও জানা যায় যে পুত্রের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার অর্থ তিনি যত কষ্টই হোক জোগাড় করবেন তাও উল্লেখ করেছেন।

প্রফুল্লকুমার জেলে বন্দী থাকার সময়ে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য যে চিঠি লিখতেন তার উল্লেখও এই পত্রে রয়েছে।

প্রফুল্লকুমারের পিতার লেখা দুটি পত্রের উল্লেখ করা হল। এই পত্রগুলির মাধ্যমে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, তখনকার পারিবারিক চিত্র, পুত্রের জেলে থাকার কারণে ভগ্নহৃদয় পিতার আক্ষেপ—এই সমস্ত বিষয়গুলির একটি পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায়।
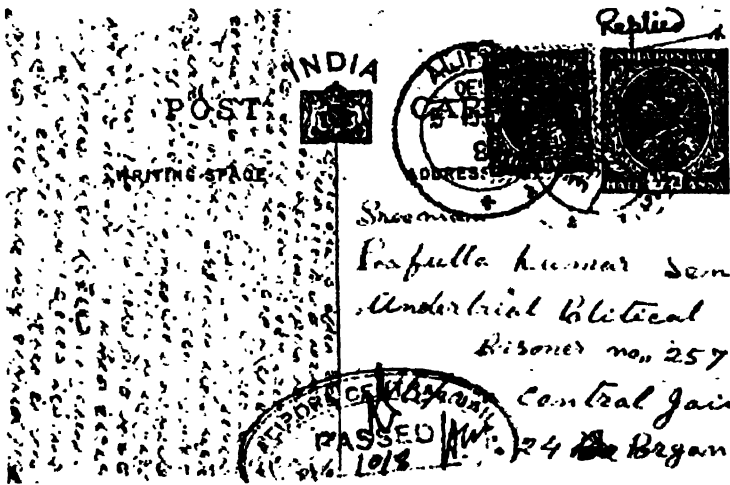
আলিপুর জেলে অবস্থানকালে প্রফুল্লকুমারকে লেখা
পিতা নবীনচন্দ্র সেনের চিঠি জেলসুপারের সইসহ

শ্রীদূর্গা

কালীকাপুর
১৯শে মাঘ

শ্রীশ্রীচরণেষু

দাদা! আপনার পত্র যথাসময় পাইয়াছি পত্রোত্তর দিতে গৌণ হইল বলিয়া মনে কিছু করিবেন না। আপনার মোকদ্দমা কি হইল জানাইবেন। মহেন্দ্রমামার ঠিকানাটা

দিবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন যেন আমাকে লিখেন। আশুমামার নিকট বহিখানা পাঠাইয়াছিলাম, না দেওয়ার কারণ কি মহেন্দ্রমামাকে বলিবেন যেন আশুমামাকে জিজ্ঞাসা করেন। বাবা বর্ত্তমানে আমাদের এখানে আছেন তিনি ভাল আছেন আপনি তাঁহার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমাদের পশ্চিমের বাড়ীর যামিনী মজুমদার ১৫ই তারিখ বুধবার দেহত্যাগ করিয়াছে। আমরা ভাল আছি।

ইতি

আপনার স্নেহের

সুহাস

দেবেন্দ্রর নিকট হইতে অদ্য পর্যন্ত একটি পয়সাও পাই নাই—পাইবার আশাও খুব কম।

পরম কল্যাণবর

বাবা। দুইমাস যাবত তোমার কোনও চিঠিপত্র পাইতেছি না। এই মাসের চিঠিখানা আমার নিকট দিবে। তোমার মোকর্দ্দমা কবে শেষ হইবে ঠিক খবর লিখিবে। তোমার টাকার দরকার হইলে কাশীনগরের তোমার বড়দিদির নিকট লিখিও আমি বর্তমান মাসে বাড়ী যাইব। আমাদের সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইতেছে।

....চক্রান্তে, তাহারা নিলাম করাইতেছে। কি করিব। কিছু করবার সাধ্য নাই। ভারত নতূন বাড়ীতে যাইতে চেষ্টা করিতেছে আমি যাইতে পারিব না। কারণ টাকা পয়সার অভাব। কি করিয়া যাইব? বাড়ী ঘরের দরকারও নাই। আমি কোনরকমে ভিক্ষা করিয়া খাইব। রবি ৬ষ্ঠ ক্লাসে পড়িতেছে। ছোট খোকা উপুড় হয়। জামাতা বাবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আমাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছে।

আশী ঃ তোমার পিতাঠাকুর

[Stamp
Alipore Central Jail
Passed]
Date 12/2/36
Signature

[Stamp
Central Jail
4FEB, 1936]
Alipore
Sreejut
Prafulla Kumar Sen
Div. II
Political Prisoner No.1510
Bomb-yard.
Alipore Central Jail
24 Parganas

এই চিঠিটি থেকে জানা যায় যে সেই সময় জেল বন্দীদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু

বান্ধবকে মাসে একখানা করে চিঠি লেখার অনুমতি পেতেন। প্রফুল্লকুমারের পিতার উক্তিটি "এই মাসের চিঠিখানা আমার নিকট দিবে" থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। নিঃসঙ্গ পিতা একমাত্র পুত্রের জেল বন্দী থাকার কারণে কন্যার শ্বশুরালয়ে ছিলেন (কালিকাপুর) চিঠি থেকে জানা যায়। পুত্রের প্রতি তীব্র অভিমানে লেখেন "আমাদের সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইতেছে।" "...বাড়ী ঘরের দরকারও নাই। আমি কোনরকমে ভিক্ষা করিয়া খাইব।" আবার স্নেহাতুর পিতার উক্তি "তোমার মোকদ্দমা কবে শেষ হইবে ঠিক খবর লিখিবে। তোমার টাকার দরকার হইলে..." নিদারুণ অসুবিধাতেও জেলবন্দী পুত্রের প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দেয়।

শ্রীহরি—

[Received 19-11-43]

ঘাশীগ্রাম
১৫/১১/৪৩ বাং

পরম শুভাশীর্ব্বাদশ্চ, বিশেষ

বাবা, তোমার তথা হইতে আসিবার সময় কথা ছিল। বাড়ী আসিয়াই তোমার নিকট পত্র দিব। কিন্তু নানা অশান্তিতে ও মনের কষ্টে এতদিন পত্র দেয় নাই। তোমার তথা হইতে যে কি প্রকারে বাড়ী আসিয়াছি সত্য মন তোমার নিকট রহিয়াছে, কায়া মাত্র বাড়ীতে আছে তোমার মোকদ্দমার কখন রায় হয় এবং কি রায় দেয় আমাকে জানাইবা। হরিঠাকুর যে আমায় টাকা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এ যাবত ও এক পয়সাও দেয় নাই। আগামীকল্য আমি শ্রীমতিকে লইয়া কালিকাপুর যাইব। আমার নিকট পত্র দিতে পারিলে কালিকাপুরের ঠিকানায় দিবা। চৌধুরী বাড়ীর তোমার বড়দিদিমা এখন একটু ভাল আছেন। মহেন্দ্র বলিয়া গিয়াছে কলিকাতা যাইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিবে। দেখা করিতে পারিল কিনা জানিতে পারিলাম না। আমার ঘরখানার কথা তোমার মহেন্দ্র মামার নিকট বলিবা যেন বর্ষার পূর্বে তৈয়ার হইতে পারে সেই বন্দোবস্ত করে। শ্রীমতিকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত রাখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীমান—তাহার শিশু সন্তান নিয়া থাকিতে কষ্ট পাইতেছে। ঘরের অভাবে শোওয়ার জায়গা হয় না সেজন্যই আগামীকল্য চলিয়া যাইবে। আর বিশেষ কি লিখিব আমরা বাটীস্থ সকল একপ্রকার ভাল আছি। আগতে তোমার কুশল জানিতে বাসনা রহিল—যদি পার তবে মাসে একখানা করিয়া চিঠি আমার নিকট দিবা। মোকর্দ্দমার সওয়াল জবাব শেষ হইল কিনা জানাইবা।

[Replied on 4/3/37]
[Stamp
Central Jail
3 MAR, 1937
Alipore,
Alipore Central Jail
passed 3.3.37]

ইতি আঃ শ্রীনবীন চন্দ্র সেন
Sreeman,
Prafulla Kumar Sen
undertrial Political Prisoner
257 Alipore Central Jail
24 parganas

এই পত্রগুলি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে আসে। বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রের হাজতবাস কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি পাওনাগণ্ডা ফেরত দিত না। জমির চাষ বাবদ ঐ টাকা বোধহয় তাঁর প্রাপ্য ছিল। ফলে তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটাতেন। নিজের পক্ষে সত্তরোর্দ্ধ বয়সে জমিজায়গার প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লকুমারের মামা মহেন্দ্র চৌধুরীর নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রফুল্লকুমারের সাথে জেলে দেখা সাক্ষাৎ চালাতেন এবং পিতা পুত্রের মধ্যে সংযোগ রেখে চলতেন। এই চিঠিখানির সময়কাল ৩.৩.৩৭। এরপর বন্দীদের মামলার রায় বের হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মামলার (টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার) রায় বের হয় ২৭শে এপ্রিল ১৯৩৭ সাল। রায়ে প্রফুল্লকুমারের ১২ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল। [Terrorism in Bengal Vol VI.]

ঢাকা জেল—আলিপুর থেকে প্রফুল্লকুমারকে disband করে ঢাকা জেলে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৩৭ সালে। ঢাকা জেলের ছাপ মারা চিঠিতে যে তারিখ পাওয়া যায় তা হল ১৪ সেপ্টেম্বর, ৩৭। চিঠিটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

From, Sisir Kumar Maitra, M.A., B.L.
Pleader, Alipur Court Calcutta

3A, Nilgopal Mitra Lane
Bhowanipur
Dated 13.9.1937

(চিঠিটিতে) Superintendent
Dacca Central Jail এর Stamp এবং সই আছে
To Prafulla Kumar Sen
Convict No. 5563A
Dacca Central Jail

Re. High Court Appeal.

Dear Sir,
আপনার ৫.৮.৩৭ তারিখের চিঠি পাইয়াছি। Appeal এখনও Ready Bound

এ ওঠে নাই। Not ready bound—আছে. Paper Bookও ছাপা হয় নাই। High Court 8th Nov. খুলিবে। High Court খুলিলেই hearing হইবে বলিয়া মনে হয়। যাই হোক Ready হইলেই খবর দিব।

আপনি instruction দেবার জন্য ইন্টারভিউ চাহিয়াছেন। আমরাও একবার ইন্টারভিউ নেয়া দরকার মনে করি। বিশেষতঃ শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয় ইন্টারভিউ লওয়ার জন্য বলিয়াছেন। তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং তিনি আমাকে ও সুকুমার বাবুকে যাওয়ার জন্য বলিতেছেন। বুঝতেই পারেন ঢাকা যাইয়া ইন্টারভিউ লওয়া ব্যয়সাধ্য। দুজনের যাইয়া দেখা করিতে অন্ততঃ ৪০/৫০ টাকা লাগিবে। আপনারা এই টাকাটা পাঠানর ব্যবস্থা করিবেন। কার্তিক সেনাপতি ও হরেন মুন্সীকেও ধীরে সমস্ত কথা জানাইবেন। কোর্ট ২রা অক্টোবর বন্ধ হইবে। টাকা আসিলে আমরা ঐ সময় যাইয়া ইন্টারভিউ লইতে পারি। পূজার বন্ধে বাড়ী যাইব। সুতরাং যাহাতে ২রা অক্টোবর এর পূর্বে টাকা পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। 6th Nov. Court খুলিবে ও তখন hearing আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং Oct.-এর 1st week এ Interview লওয়া সুবিধা। টাকা না আসিলে Interview লওয়া সম্ভব নয়।

Judgement-এর copy আমরা ২খানা লইয়াছি। একখানা হাইকোর্ট-এ file করিতে হইয়াছে এবং একখানা আমাদের কাছে আছে। Judgement-এর copy সম্বন্ধে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। Alipore Central Jail-এ লিখিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

টাকার কথা যাহা লিখিয়াছেন—তাহাতে আমার আর বলার কিছু নাই। আপনার অনুরোধ মত আপনার পিতাকে টাকার কথা কিছু লিখিব না। আপনিই লিখিয়া ব্যবস্থা করিবেন এবং যাহাতে Nov.-এর 1st week-এর আগে সেই ব্যবস্থা করিবেন।

আপনার মামা মহেন্দ্রবাবু আমার সহিত অনেকদিন পূর্ব্বে দেখা করিয়াছিলেন। বলিয়াছেন—অভাব অভিযোগ টাকা দেওয়া কষ্টসাধ্য। তবু দিবেন বলিয়াছেন। তিনি যে দিবেন সে ভরসা কম। যাইহোক আপনি তাহাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিবেন যে তিনি যেন Nov.-এর 1st week-এর মধ্যেই দেন। আমিও তাহাকে লিখিব। কিন্তু জানেন ত আপনি খুব তাগিদ দিয়া চিঠি না লিখিলে তিনি যে টাকা দিবেন মনে হয় না।

আমি ভাল আছি। আশা করি আপনি ভালই আছেন। আমার নমস্কার লইবেন।

দীনেশবাবু বলেন Interviewটা খুব প্রয়োজন—একথা ধীরেন কার্ত্তিক ও হরেনকেও বলিবেন।

ইতি

শ্রী শিশিরকুমার মৈত্র

Beloved Martyer Haren Munshi died on 30/1/38 A.D. Sunday (Saturday) night 29 16/10/44 B.S.

প্রফুল্লকুমার একথা লিখেছেন কারণ উকিল শিশিরকুমার মৈত্র তার পূর্বোক্ত চিঠিতে এদের কথাও উল্লেখ করেছেন। হরেন মুন্সী প্রফুল্লকুমারের স্নেহধন্য অনুজ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু তাঁর কাছে গভীর দুঃখের ছিল।

উপরোক্ত চিঠিটি থেকে জানা যায় প্রফুল্লকুমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। মামলা লড়েন শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় মহাশয়। উকিল ছিলেন শ্রী শিশিরকুমার মৈত্র (উপরোক্ত চিঠিটি ওনারই লেখা), তখন প্রফুল্লকুমার নিদারুণ অর্থকষ্টে সময় কাটাচ্ছেন। পিতা নবীনচন্দ্র বৃদ্ধ। একমাত্র পুত্র জেলবন্দী। ৪০/৫০ টাকা যোগাড় করাও কষ্টের। বাবাকে টাকার কথা লিখতে বারণ করেছেন। কারণ তিনি টাকা যোগাড়ে উদগ্রীব হবেন। প্রফুল্লকুমারের মামলার (টিটাগড় ষড়যন্ত্র) judgement কপিটি উদ্ধার করা যায়নি। এই চিঠিটি থেকে কারণটি জানা যায় দুকপি (Judgement-এর) পাওয়া গিয়েছিল। এক কপি হাইকোর্ট-এ জমা দেওয়া হয়েছিল। আর একখানা ছিল উকিলদের কাছে। ঢাকা জেলে তিনি তখন convict (নং ছিল ৫৫৬৩এ) হিসেবে রয়েছেন।

আলিপুর থেকে প্রফুল্লকুমার, হরেন মুন্সী ও কার্তিক সেনাপতি প্রমুখকে ঢাকা জেলে পাঠানো হয়েছিল। (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। জেল গেটেই history ticket দেখে প্রফুল্লকুমারকে আলাদা করে ফাঁসির ডিগ্রীতে রাখে। অন্যান্যদের রাখা হয় শকুন্তলায়। আলিপুর জেলের সঙ্গে ঢাকা জেলের থাকবার ব্যবস্থার প্রভূত পার্থক্য ছিল। এই জেলে বিপ্লবীদের উপর অকথ্য অত্যাচারও চালানো হত। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রফুল্লকুমার অনশন শুরু করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অনশন শুরুর কয়েকদিন পর থেকে পুলিশ force feeding-এর নামে অনশনকারীদের উপর চালাত প্রাণঘাতী অত্যাচার। এইবারে ঢাকা জেলে অনশন চলাকালীন force feeding-এর সময় খাওয়ার নলের মধ্য দিয়ে খাদ্যনালীর পরিবর্তে শ্বাসনালীতে ঢুকে যায় সহযোদ্ধা হরেন মুন্সীর। জেলের ডাক্তার প্রফুল্ল প্রসূণ চৌধুরীর অনবধানতায় একটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল। হরেন মুন্সীও কুমিল্লার ছেলে ছিলেন এবং প্রফুল্লকুমারের অনুরক্ত ছিলেন। হরেন মুন্সীর সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের সম্পর্কের পরিচয় pleader শিশিরকুমার মৈত্রর চিঠিতে ছিল। প্রফুল্লকুমার নিজের 'আত্মকথা'য় ক্ষুব্ধ চিত্তে এই মহাপ্রাণের অকাল প্রয়াণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্বরচিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দেওয়া হল।

দুঃ বন্দনা
মহান কর্মী, তুমিই ধন্য

এসেছিলে সাথে মোর সইতে শুধু লাঞ্ছনা
বিদায় বেলায় নিয়ো দাদুর গর্বদীপ্ত বন্দনা।

হরেন মুন্সীর মৃত্যুর উল্লেখ শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে জেলে আত্মহত্যা—চিকিৎসা বিভ্রাটে মৃত্যু অধ্যায়ে লিখেছেন "জেলে চিকিৎসা বিভ্রাটে বা গাফিলতিতে মারা গিয়াছে এমন সংখ্যাও আছে। ঢাকা জেলে হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যু অস্বাভাবিক। বিপ্লবী হরেন্দ্রকে চিকিৎসক এমন করিয়াই পথ্য (দুধ) দিলেন—যাহার পরিণাম মৃত্যু।"

বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থের অনশনে জেলে মৃত্যু অধ্যায়ে এই মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন।

এই মৃত্যুর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। হিন্দু, মুসলমান আপামর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা জেল ঘিরে ফেলে। জেল সুপার (এই সুপারের সই প্রফুল্লকুমারের চিঠিতে আছে কিন্তু নাম উদ্ধার করা যায়নি) বাধ্য হয়ে তরণী সেন, মদন ভৌমিক প্রমুখ নেতাকে বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে বাধ্য হন।

ঢাকা জেল থেকে এরপর প্রফুল্লকুমার স্থানান্তরিত হন কুমিল্লা জেলে। পুলিশ ভাব দেখায় যেন অল্পদিনের মধ্যে এই বিপ্লবীদের মুক্তি দেবে। বৃদ্ধ পিতা নবীনচন্দ্রও আশান্বিত হন। তিনি কুমিল্লা জেলে ছেলের সাথে দেখা করতে আসতেন। বৃদ্ধের সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কুমিল্লা জেলে প্রফুল্লকুমার ছিলেন ১৯৩৮ সালে (বাংলা ১৩৪৪ সন)। কিছুদিনের মধ্যে প্রফুল্লকুমারকে কুমিল্লা থেকে দমদম স্পেশাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিভিন্ন জেলে প্রফুল্লকুমারের অবস্থানের বিবরণ

(আলিপুর জেল এবং কুমিল্লা জেল সুপারের সই করা খাতায় এই বিবরণ পাওয়া যায়)।

1. Alipore Central Jail 1935-এর January-তে arrest হওয়ার পর থেকে—1937 July.
2. Dacca–Central Jail 1937-1938.

3. Comilla Jail–March 1938.
4. DumDum Central Jail–July 1938-1942.
5. Alipore Central Jail–1942-এর last part upto release,
৩০শে আগস্ট ১৯৪৬ রাত্রি ৮টা।
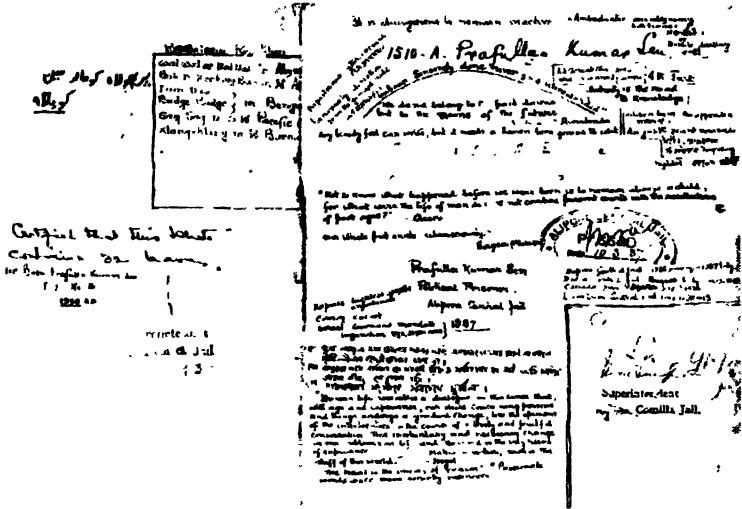
বিভিন্ন জেলে সুপারদের সই

কুমিল্লা জেল থেকে প্রফুল্লকুমারকে দমদম স্পেশাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ছিলেন ৪নং ইয়ার্ডে। এইখানে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। জেলের খাতায় জেলের সিল ও সুপারের সই (বিভিন্ন জেলের ছাপ ও সই) সেইসব জেলে প্রফুল্লকুমারের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে।

জেলে বিপ্লবীদের ঘানি টাঁনা, সাফাই কাজ, ছোলা পিষবার কাজ। (সে যুগেও জেলে বলদের পরিবর্তে মানুষকে দিয়ে ঘানি টানানো হত।) প্রথমদিকে জেল জীবন ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল। কোন খবরের কাগজও বিপ্লবীরা পড়তে পেতেন না। জেল লাইব্রেরির সুযোগও তাদের ছিল না। সঙ্গী ছিল সাধারণ কয়েদীরা। এইরকম এক বিপ্লবীদের প্রতি অনুরক্ত কয়েদীর (বাবুলাল) জীবন নিয়ে প্রফুল্লকুমার পরবর্তীকালে লিখেছেন—"কারাসাথী বাবুলাল"।

ফলে প্রায়শঃই বিপ্লবীরা অনশন সত্যাগ্রহ অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হতেন এবং এর ফলস্বরূপ বিপ্লবীদের কষ্টকর জেল জীবনে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তারা দৈনিক পত্রিকা পড়তে পেতেন। জেলের দৈনন্দিন কাজ তখন গিয়ে দাঁড়ায় সুতা কাটায় (পরবর্তী পর্যায়ে M.L.A Dhirendra Nath Dutta-কে লেখা চিঠি থেকে এইসব

তথ্য পাওয়া যায়।)

আলিপুর জেলের ১০.৫.৩৭ passed খাতায় stamp ও সই আছে এবং ঐ খাতায় ১১০ leaves আছে, ঐ খাতাটি কুমিল্লা জেল superintendent check করে সই এবং তারিখ দেন ৯.৮.৩৮।

জেলে সময় কাটাতেন পড়াশোনা করে। মনের জোর বাড়াতে সবসময়ের সঙ্গী করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' (Song of the Sannyasin)। প্রফুল্লকুমার এই গানগুলি কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং আমৃত্যু এই গানগুলি উল্লেখ করতেন। দু একটি যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, যেমন—

(১)

ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙ্গো না কখন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপযশ—কোথাবা সুখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব-আনন্দে-অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসী, নির্ভীক অন্তরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

(২)

সুখতরে গৃহ করো না নির্ম্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
হউক কুৎসিত, কিম্বা সুরন্ধিত,

ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল স্রোতস্বতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

'সন্ন্যাসীর গীতি'র গানগুলি তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। [পরবর্তীকালে কন্যাদেরও জন্মদিনে সন্ন্যাসীর গীতি উপহার দিতেন এবং গানগুলি মুখস্থ করিয়েছিলেন।] এর মাধ্যমে জেলের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে শক্তি সঞ্চয় করতেন। সময় কাটানোর উপাদানগুলির আরও কিছু নমুনা পাওয়া যায়। একটি ছিল word-এর repetition খোঁজা।

Wal Wal or Val Val in Abysinia
Buk-Buk or Bug-Bug in N. Africa
Dum-Dum
Budge-Budge in Bengal
Sag-Sag in S.W.Pacific Ocean
Klang-Klang in W.Burmah

জেলের সময় কাটানোর আর একটি পন্থা ছিল তাঁর জ্যোতিষচর্চা এবং বার নির্ণয় (১৬০০ বছরের চিরপঞ্জিকার সাহায্যে)।

১। ইংরেজি বৎসর অনুসারে চিত্র। ২। বার নির্ণয়ের চিরপঞ্জিকা (১৬০০ বছরের চিরপঞ্জিকার সাহায্যে)

ইংরেজি বৎসর অনুসারে [২নং চিত্র]।

জেলের খাতায় সরমা দের একটি রুবাই-এর অনুবাদ পাওয়া যায়।

আমাদের কাম্য
সেই সাম্য
ভ্রাম্যমানের যাত্রা শেষ;
মিশেছে যে যায়
সবপথ এসে
শেষ হয়েছে আপনি অশেষ।

একটি খাতায় প্রফুল্লকুমার বিভিন্ন গান (সেই যুগে যেগুলি বিখ্যাত হয়েছিল) 'গানের বই' হিসেবে লিখে রেখেছেন। সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় গানের সাথে তালের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়। অপর একটি খাতা যেখানে তিনি অতীব সুন্দর হস্তাক্ষরে উর্দু শেখার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি জেলে বসে উর্দুও শিখেছিলেন। [পরিশিষ্ট ঃ চিত্রাবলী দ্রষ্টব্য] জেলের প্রাত্যহিক জীবনে যা পড়তেন, যা অনুধাবন করতেন তা লিখেও রাখতেন। লেখাগুলি তাঁর অতীব সুন্দর অননুকরণীয় হস্তাক্ষরের পরিচয় দেয়।

খাতাগুলি পড়ার পর তাঁর কিছু চিন্তাধারার, ভাবনার পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রফুল্লকুমার তাঁর জীবনের প্রায় বারো বছর কাটিয়ে ছিলেন কারাগারের অন্তরালে। মুক্ত কর্মময় জীবনকে পিছনে ফেলে, এই বদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি হারিয়ে ফেলেননি। জেল জীবনে বিভিন্ন বই থেকে তিনি যে সঞ্চয়নগুলি তাঁর জেলের খাতার পাতাগুলি ভরে স্থায়ী করে রেখেছিলেন, তার প্রতিটি ছত্রে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর একান্ত মানসিকতা, তাঁর প্রকৃতি প্রেম, (এই প্রকৃতির টানেই তিনি জেল পরবর্তী মুক্ত জীবনে কেদার বদ্রী ভ্রমণে ছুটে গিয়েছিলেন) এমনকি মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। উদারমুক্ত আকাশ অনেক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে এনে দিত সুদূরের আহ্বান, তাই তাঁর সঞ্চয়নে প্রথমে পাওয়া যায় প্রবোধ সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে"র কিছু কিছু অংশের প্রতিলিপি। এই অনুলিপি সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে মনে হয় তিনি ভ্রমণের আনন্দ, মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রকৃতির উদারতা প্রভৃতি সবকিছুরই রসাস্বাদন করতেন। একজন নিরলস রাজনৈতিক কর্মী, যাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে—কারান্তরালের কঠোর জীবনকেও তিনি সহনীয় করে তুলেছিলেন বই-এর ভিতর ডুব দিয়ে—অনুমান করা যায় যে পড়ার সময় বই-এর যে সমস্ত অংশগুলি তাঁর মনকে স্পর্শ করত, যে লাইনগুলির মাঝে তিনি তাঁর নিজের মানসিকতার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন—সেগুলিই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—হয়ত পরবর্তী সময়ে বইগুলি যখন কাছে থাকবে না তখনও যাতে তাঁর দৃষ্টি সেই অংশগুলিকে ছুঁয়ে যেতে পারে, হয়ত বা নিছকই খেয়ালে—শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য, নাকি বন্দী জীবনের কঠোরতা এবং একঘেঁয়েমীর মুহূর্তগুলি কিছুটা ছন্দ, কিছুটা আনন্দ দিয়ে সহনীয় করে তোলার জন্য এই ছিল তাঁর ক্ষুদ্র প্রয়াস। কেন তিনি খাতা ভরে মুক্তোর মতন হস্তাক্ষরে পাতার পর পাতা অন্যের লেখা টুকে রেখে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় আজ আর নেই। তবে একথা

সত্য যে মানুষ তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, তার পঠন-পাঠনের সেই অংশগুলিই কালির আখরে স্থায়ী করে হাতের কাছে রাখতে চায়—যা তার ভাল লাগে, যা তাকে দেয় আনন্দের অনুভূতি। প্রফুল্লকুমারের সঞ্চয়ন সেই অর্থে তাঁর মানসিক চিন্তার বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তুলে ধরেছে।

প্রফুল্লকুমারের বন্দীজীবনে লিপিবদ্ধ করা যে বইগুলির অংশবিশেষ পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে প্রবোধ সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে", "ঘুমভাঙ্গার রাত", "আলো আর আগুন", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দৃষ্টি প্রদীপ ও অভিযাত্রিক", শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিপ্রদাস" অচিন্তকুমার সেনের "টুটা ফুটা", বুদ্ধদেব বসুর "সাড়া", সুবোধ রায়ের "নাটমন্দির", সুবোধ ঘোষের "ফসিল" এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "ঘরে বাইরে", "যোগাযোগ", "জীবনস্মৃতি" আর বিচিত্রার কার্ত্তিক ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ "নবীন কবি"।

বিভিন্ন ধরনের লেখক, যাঁরা বাংলা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি পরিচয় করে নিয়েছিলেন বই-এর মাধ্যমে।

প্রবোধ সান্যালের লেখা "মহাপ্রস্থানের পথে" থেকেই প্রফুল্লকুমারের অনুলিপির যাত্রা শুরু। এই অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর প্রথম অনুভূতি মনুষ্যমন সম্পর্কে—"মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন, আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে—বন্ধুত্বের প্রয়োজনে, প্রেমের প্রয়োজনে, স্বার্থের প্রয়োজনে।" সেই জীবনে "প্রতিদিনের লাভ ক্ষতি", চূর্ণ-ভগ্ন জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার পিছনে প্রবোধ সান্যালের ভাষায় মন এক "পরম আহ্বান" শুনতে পায়। যে মানুষ তা পায় তার সাথে হয়ত মিশে গিয়েছিল প্রফুল্লকুমারের ৩৭/৩৮ বছরের যুবক মন।

দেখা গেছে যে ১২ বছর সমাজ থেকে বহুদূরে বিভিন্ন কারাগার ছিল প্রফুল্লকুমারের ঠিকানা। ফেলে আসা সেই সমাজ সংসারের কথাও তার মনে পড়ত বৈকি! যে সমাজ মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তৈরি। তারই মাঝে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন—কারাগারে যে প্রফুল্লকুমার তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত করতেন তিনি তো সেই সমাজেরই ফসল। সেই সমাজই তো তাঁর বিশ্বাস, অনুভূতি, চিন্তা, ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোমন্দ বোধ, সর্বোপরি তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধ সব কিছুরই ভিত রচনা করে দিয়েছে। তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল অতি শৈশবে। কিন্তু সারাজীবন সেই বেদনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কুমিল্লা থেকে প্রফুল্লকুমারকে দমদম স্পেশাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ছিলেন দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারে ৪নং ইয়ার্ডে। এই

জেলের খাতাতে লেখা আছে ১৩৪৬ বাংলা সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ ইং-৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক প্রায় ৭টায় তাঁর পিতা নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সেই সংবাদ তিনি পেয়েছেন ২৬শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৩৯।

পিতা নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর প্রেক্ষাপট ছিল অতীব করুণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যতদিন সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন জেলে অশক্ত শরীরে তিনি ছুটে যেতেন একমাত্র পুত্রকে দেখবার আশায়। অবশেষে ১৯৩৭-র ২৭শে এপ্রিল মোকদ্দমার রায় বের হয়। রায়ে প্রফুল্লকুমারের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ পিতা উচ্চ আদালতে আপিল করেছিলেন সে ঘটনা পূর্বে হাইকোর্টের উকিলের চিঠিতে উল্লেখ আছে। আপিলে প্রফুল্লকুমারের দ্বীপান্তর এবং তিন বৎসর সাজা রদ হয়। কিন্তু গ্রামের কোন ব্যক্তি ভুল সংবাদ পিতাকে দেন। তিনি জানান যে পুত্রের দ্বীপান্তর রদ হয়নি। ফলে পুত্রশোকে কাতর পিতা পুকুর ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। বৃদ্ধ পিতার মানসিক অবস্থার কোন তথ্যই আজ আর পাওয়া যাবে না। এরপর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন paralysis অবস্থায়। একমাত্র কন্যা সুহাসিনীই তাঁর শেষের সেদিনগুলির সঙ্গী ছিলেন। তিনি পিতাকে সুস্থ করার প্রচেষ্টায় গরুর গাড়ি করে কুমিল্লা শহরে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যান। কুমিল্লার নামকরা কয়েকজন ডাক্তার বিনা ভিজিটে বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রকে দেখেন। তাঁদের বলতে শোনা গেছে—"যাঁর পুত্র দেশের দশের উপকারের জন্য জেলে বন্দী, তাঁর পিতার চিকিৎসা করা আমাদের পক্ষে গৌরবের।" অবশেষে ১৯৩৯-এর ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার পুত্র অদর্শনে কাতর পিতা পরলোক গমন করেন। এই সংবাদ ১২ই ডিসেম্বর পান জেল বন্দী পুত্র। তিনি জেল থেকে একমাত্র ছোট বোন সুহাসকে যে চিঠি দেন তাঁর অনুলিপি পড়ে বোঝা যায় পিতার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা। তাঁর কারাগারে থাকার শাস্তি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে কতখানি আঘাত করেছিল তা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। নিম্নে লিখিত চিঠিগুলি তার পরিচয় দেবে। তিনি প্রায় প্রতিটি চিঠিতে পিতার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরদিনই তিনি কয়েকটি চিঠি লেখেন তা এখানে অবিকৃতরূপে তুলে ধরা হল।

To
Sreemati Suhasini Mazumdar
C/o Late Babu Nabinchandra Sen
P.O. Meahbazar
Vill-Ghashigram
Tipperah
12.12.39
[দমদম কেন্দ্রীয় কারাগার
৪নং ইয়ার্ড হতে
২৬শে অগ্রহায়ণ
১২ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
বাড়ীর ঠিকানায়]
১। কল্যাণীয়াসু। স্নেহের বোন সুহাস।

গত তিনমাস তুই আমায় অভিমান করে চিঠি দিসনি—শেষে কি এতো বড়ো নির্ম্মম আঘাত পাবো বলেই? সংসারে আপন বলতে কেউ নেই, আজ আমি পরিত্যক্ত সর্বহারা গৃহহারা পিতৃহীন; তার উপর কারাগারে বিনা দোষে বন্দী আমি অসহায়—আমার ব্যথা অন্যে না বুঝুক—তোর তো বোঝা উচিত! আমি ও মানুষ—আঘাতের পর আঘাত আর কতো সইবো? স্বর্গীয় পিতার ঐকান্তিক অন্তিম ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। শেষ সময়ে হতভাগ্য আমি চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না—আমার এ মর্ম্মজ্বালা ছোটবোন হিসাবে তোর উপলব্ধি করা উচিত। মনে নানা কথাই আজ উঠ্‌ছে আরো উঠবে। সারাজীবন ধরে আমায় মর্ম্মপীড়া ভোগতে হবেই। বাবার শেষজীবনের দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনার কথা মনে হলে বুক ফেটে কান্না আসে।

বিচারক যদিও কঠিন দণ্ড দিয়েছেন আমায় তা প্রচণ্ড রূপে বেজেছিল আমার সরল পিতার কোমল বুকে। বাবা সে আঘাত সইতে পারলেন না, তাই আজ মনে হয় আমিই বাবার এ মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আজ আমি অসহায়, আমার শেষ সম্বল সর্ব্বশেষ অবলম্বন আমায় অকূলে ভাসিয়ে নীরবে চলে গেছেন—এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই আমার।

তুই বাবার ধন্যি সন্তান। স্বীয় জীবন বিপন্ন করে তুই-ই তো এতোদিন পিতার প্রতি কর্তব্য যথাযথ পালন করে এসেছিস। মেয়ে হয়েও তুই বাবার উপযুক্ত সন্তান; শ্রাদ্ধাদি শেষ পারলৌকিক কৃত্যাদি তুই-ই সাধ্যানুযায়ী করবি, তাতেই বাবার স্বর্গীয় মুক্ত আত্মা প্রীত হবেন। আমি হতভাগ্য বন্দী অসহায় অক্ষম, কারাগারে কিছু করা সাধ্যাতীত। তবু সাধ্যানুযায়ী নিয়মাদি প্রতিপালন করতে চেষ্টা করছি। যদি ইতিমধ্যে

বা কোনদিন মুক্তি পাই, তখন সাধ্যানুযায়ী যা করণীয় (বাবার পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী) তা করবো। পিতৃকার্যে বা মাতৃকার্যে সন্তানের কাছে সময় অসময় কিছু নেই। সুযোগ মতো যথাসাধ্য করবো। বাবার আদেশ আমার স্মরণ আছে এবং থাকবে। বাবার মুক্ত আত্মার সদ্গতি হবেই—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। তবু এখান হতে সাধ্যানুযায়ী কিছুদিনের ছুটির জন্যে চেষ্টা করছি। বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। তবে বাহির হতে চেষ্টা করলে হয়তো কিছু হতো—কিন্তু আমার আছে কে?

বাবার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি আছে, আমি আজ সেসব স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছানুযায়ী তোকেই দিচ্ছি। আশাকরি "বাবার দান" গ্রহণ করে তাঁর আদেশ পালন করবি। তোর সাধ্যানুযায়ী শ্রাদ্ধের দিন ২/৪জন হলেও কাঙ্গালী ভোজন করাবি। তাদেরও যে আমার মতো আর কেউ নেই।

বাবার অন্তিম সময়ে তোরা সবাই কাছে ছিলি তো? বড়দা, তাঁর ছেলে মেয়ে, তোর ছেলে মেয়ে কে কে উপস্থিত ছিলো জানাবি।

জেলের নিয়মানুযায়ী প্রতি মাসে মাত্র একখানা চিঠি লেখতে পারবো। সে চিঠিখানা আজ হতে তুই-ই পাবি।

যাঁরা বাবার শেষ সময়ে তোর সাহায্য করেছেন নানা ভাবে, তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাবি। তাদের ঋণ মনে থাক্‌বে, অটলবাবুকে ও দত্তপাড়ায় ও অন্যান্য আত্মীয়দের খবর দিবি যথাসাধ্য। অটলবাবুর দান অসীম। আমার সব মনে থাকবে। বড়দা আমার পত্র পেলেন কিনা জানাবি। বড়দার কথাও ভুলবো না। অন্যান্য আত্মীয় বান্ধবদের যথাসাধ্য খবর দিতে চেষ্টা করবি। নিজ স্বাস্থ্যের ও সামর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ খুব সংক্ষেপ করবি। আমি এসে পরে যা করবার তোরই ইচ্ছানুযায়ী করতে চেষ্টা করবো।

কিরণের পত্রেই আমি এই মর্ম্মান্তিক খবর কাল পেয়েছি। মহেন্দ্র মামাও এসে খবর জানিয়ে গেছেন। এ সঙ্গে কিরণের পত্রেরও ভিন্ন পত্রে জবাব দিচ্ছি। পরমাত্মীয় কবিরাজ মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবি তিনি সাধ্যানুযায়ী করেছেন— তা আমি ভুলবো না। কিন্তু হতভাগ্য আমি আমারই অদৃষ্ট খারাপ।

ইতি

তোর রাঙ্গাদা—

প্রফুল্ল

জ্ঞাতি বাড়ীর মেজো কাকার পরামর্শ ও দাদাদের উপদেশানুযায়ী সংক্ষেপে কাজ সম্পন্ন করবি। অটলবাবুর মত তো চাই-ই। ইতি—

প্রফুল্লকমার জেলে বসে চিঠি লেখেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত

শরৎচন্দ্র বসু Bar-at-law মহাশয়কে। [এখানে উল্লেখ্য ইনিই সুভাষচন্দ্র বসুর মেজদাদা বিখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু]

চিঠিটি ছিল—

বিনীত নিবেদন ঃ কাল বাড়ীর চিঠি পেয়ে জানতে পেলুম আমার পূজনীয় পিতৃদেব (বাবু নবীনচন্দ্র সেন) গত ৫ই ডিসেম্বর বাং-১৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার স্বগ্রামে (কুমিল্লা জেলায়) দেহত্যাগ করেছেন। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্রসন্তান। আমি ছাড়া তাঁর পারলৌকিক কার্য্যাদি সম্পাদনের আর কেউ নেই। আপনি জানেন—আমাদের হিন্দুদের মা-বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। আমি বঙ্গীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৩দিনেই (পৈতাধারী বলে) শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। তাই আজ আপনাকে বিশেষ করে জানাচ্ছি আপনি অনুগ্রহ করে পত্রপাঠ স্বরাষ্ট্রসচীব স্যার নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করে আমার স্বর্গীয় পিতার শেষ কৃত্যাদি (শ্রাদ্ধাদি) করবার জন্যে অন্ততঃ একমাসের ছুটির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। স্বরাষ্ট্র সচীবের কাছে আপনার চেষ্টা ফলবতী হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। এক মাসের ছুটির (suspension of my sentence) প্রয়োজন এই জন্যে যদি আমার এই পত্র আপনার পেতে বিলম্ব হয় এবং এদিকে সময় অতীত হয়ে যায়, তবে আমার পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী অনন্যোপায় হলে একমাসেও শ্রাদ্ধাদি করতে আমি পূর্ব্বেই আদিষ্ট হয়েছি। আমার পিতা গত প্রায় একবছর ধরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। এসব বিষয় আমি পূর্ব্বে এই জেল পরিদর্শক রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম.এল.এ (টাকীর জমিদার) মহাশয়কেও বলেছিলাম। দয়া করে জেনে নেবেন। শ্রাদ্ধের পর সপ্তাহ খানেক স্বর্গীয় পিতার পরিত্যক্ত Properties গুছাতে প্রয়োজন হবে মাত্র।

যদি আপনি বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত থেকে অপারগ হন, তবে দয়া করে উক্ত হরেনবাবুকে কিম্বা কুমিল্লা, নোয়াখালী বা ঢাকার কংগ্রেসী সদস্যদের (এম.এল.এ) সাহায্যে চেষ্টা করাবেন। তাঁরা (উক্ত সদস্যগণ) আমার পরিচিত কিন্তু ঠিকানা জানিনে বলে পৃথক চিঠি দিতে পাচ্ছি নে বলে ক্ষমা করতে বলবেন।

স্বরাষ্ট্র সচীব মহাশয়কে বলবেন—তার এ দয়া আমার মনে থাকবে এবং বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হবে না। আশাকরি আমার স্বর্গীয় পিতার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

উৎকণ্ঠিত আছি। কি হলো দয়া করে জানাবেন।

ইতি
বিনীত
প্রফুল্ল সেন

To
Sj Sarat Chandra Bose
Bar-at-Law
1, Woodburn Park
Calcutta
12.12.39

Letter withheld by the I.B. and informed me on 19th December, Tuesday 1939

Sent a petition, to the Hon'ble Home-minister, Govt. of Bengal. through the supdt. Dum Dum ct. Jail on 24th December, 1939

24th December 1939 or [True Copy]
8th Paush 1346 B.S.

To
The Hon'ble Home Minister, Government of Bengal.
Through the Superintendent. Dum-Dum. Central Jail.

Sir,

Most respectfully I beg to put the following for your kind consideration. I am an unfortunate person, having lost my father on 5th December, 1939. (19th Agrahayan 1346 B.S.). This news was transmitted to me on the 11th of December, through a letter from my nephew. On the same date I had seen the superintendent of the Jail and asked him whether it was possible to arrange Sradh Ceremony inside the jail. He said that he was afraid that it was not possible (to arrange Sradh Ceremony in jail). So on the 12 December, I had written a letter to Babu Sarat Chandra Bose, M.L.A. for making necessary arrangements though I regret to say that that letter was withheld by the I.B. So no Sradh Ceremony was performed which causes me great anxiety as I am the only son of my father. Moreover my father, with his last breath had laid an injunction on me to perform it either on the 13th day or 31st day after his death. The first is past. So I appeal to you that you will kindly suspend my sentence for a few days so that I may go and perform the Sradh ceremony on the 31st day outside.

Hoping that this will be granted.

[Rejected by the Govt. and informed me the contents on 15.1.40]

Yours sincerely
Prafulla Kumar Sen
Div.II Political Prisoner

জেল থেকে একমাত্র ছোট বোন সুহাসকে লেখা চিঠি পড়ে পিতার প্রতি অপরিসীম

শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা বোঝা যায়। তাঁর কারাগারের শাস্তি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে কতখানি আঘাত করেছিল তা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন—তাই প্রায় প্রতিটি চিঠিতে তিনি পিতার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। সুহাসের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান, পিতার শেষ জীবনে তাঁর নিজের কর্তব্য পালন করতে না পারার অনুশোচনা তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই ছোট বোনকে তিনি সব চিঠিতেই "বাবার ধন্যি মেয়ে" বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং পিতার 'হতভাগ্য', 'অসহায়' পুত্র হিসেবে "কারাগারে কিছু করা সাধ্যাতীত" ইত্যাদি বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। তবু জেলে বসেই "সাধ্যানুযায়ী নিয়মাদি প্রতিপালন করতে চেষ্টা করছি।" সামাজিক নিয়মাদি পালনের মাধ্যমে মৃত পিতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা অর্পনের চেষ্টা দেখা যায়। পিতৃ-আদেশে অসময়ে হলেও তাঁর পারলৌকিক কার্যাদি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের ও সরকারি কর্তাব্যক্তির (হোম মিনিস্টারের) নিকটও বারবার আবেদন করেছেন, কিন্তু I.B. কর্তৃক withheld হওয়ায় সেই চিঠিও গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।

তাঁর চিঠিতে সংসারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং পিতৃঋণ নিজের কাঁধে তুলে নেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তিকে জেল থেকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে সংসার দরদী একটি মনের প্রকাশ এত সহজ ও অকৃত্রিমভাবে ঘটেছে তাতে মনে হয় দেশের মুক্তি যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিলেও পিছনে ফেলে আসা সমাজকে তিনি কখনই অস্বীকার করতে চাননি। তাই "মহাপ্রস্থানের পথে"র যে অংশ সমাজের কথা, সমাজ-বন্ধনের কথা বলে, তা তিনি গভীর আবেগ দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন—"দু'টী বন্ধন আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, সে হচ্ছে স্নেহের ও সেবার। ...মানুষকে ভালবাসতে হবে ও ভালবাসা পেতে হবে, সেবা করতে হবে ও সেবা নিতে হবে। মানুষের সেবাকে যে অস্বীকার করলো, যে মানলো না স্নেহের বন্ধন সে হতভাগ্য বিষাক্ত করে গেল মানব সমাজ...তাকে আমরা বোহেমিয়ান বলবো কিন্তু মানুষ বলা চলে না। ...যদি সমাজের কোন একটা আকারকে প্রত্যেকে না মেনে নেয়, তবে সমগ্র জগৎ মুহূর্তে মরুভূমিতে পরিণত হবে। পৃথিবীতে স্নেহ ও সেবা নেই, প্রেম ও মোহ নেই, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংসর্গ নেই, তবে তার ভবিষ্যৎ চেহারা কেমন দাঁড়াবে।"

এর মধ্যে আমরা বহুযুগ আগের গ্রীক দার্শনিক Aristotle-এর কথার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই। সমাজবিজ্ঞানে এই তত্ত্ব এক মৌলিক সত্য বলে স্বীকৃত।

সংসার বন্ধন স্বেচ্ছায় ছিন্ন করে যিনি কারাগারের বন্দী জীবন স্বীকার করে

নিয়েছিলেন, সেই সংসার সম্বন্ধে তিনি বীতস্পৃহ হয়ে ওঠেননি কখনও। সংসারের থেকেও অনেক বড় ডাক "দেশের ডাক" তিনি শুনতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর মন সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। আবার এ ডাক তো সেদিনের সব মানুষের অন্তরে পৌঁছায়নি, তাও তো সত্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধনের মূল্যও প্রফুল্লকুমারের উপলব্ধ সত্য। তাই বোধ হয় তাঁর অনুলেখনে লেখক প্রবোধ সান্যালের সেই বোধ স্থান পেয়েছে—"আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী, দুর্যোগ দুর্দ্দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথনির্দেশক ও ছড়িদার বন্ধুটি, সাথীটি এখান থেকে নেবে বিদায়। আজ মনে পড়ে যে সে আমাদের আত্মীয় নয়, সে নিতান্ত পর, ...মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতায়, ...আমিও তীর্থে দেবতাকে যা দেইনি, তাকে তাও দিয়েছি, দেবতা পান পূজা, মানুষ পায় প্রীতি। সাথী আমার বড়ো আপন, দেবতার চেয়েও আপন নয় কি?"

"দেবতার চেয়েও আপন নয় কি?" পূজা থেকে প্রীতি অনেক বড়ো এক দিক দিয়ে। যাকে পুজো করি তাকে নিজের চেয়ে অনেকটা উপরে উঠিয়ে রাখি আমরা, অনেকখানি দূরে রাখি তাকে—তার পদপ্রান্ত অবধি আমাদের সীমানা। কিন্তু প্রীতির বন্ধনে যার সঙ্গে আবদ্ধ হওয়া যায়—তাকে বুকে টেনে নেওয়া যায়। সে মিলনে কোনও দূরত্ব থাকে না। দেশকে যিনি ভালোবেসেছিলেন—প্রকৃত অর্থে তিনি তো দেশের মানুষকেই ভালোবেসেছিলেন। দেশ মানেই তো দেশের মানুষ—অমূর্ত কিছু নয়। মূর্ত রক্তমাংসের শরীরেই তো নির্যাতিত, নিপীড়িত ভারতবর্ষ দেশপ্রেমিকদের কাছে ডাক পাঠিয়েছিল। যারা সেই ডাক শুনতে পেয়েছিলেন তারা অনাত্মীয়, নিতান্ত যারা পর দেশের আপামর সেই জনসাধারণকে তাঁরা কি ভালবাসা, প্রীতি দিয়ে আপন করে নেননি?

সেই শিক্ষাই প্রফুল্লকুমারের কাছ থেকে পাওয়া যায়, কেবল দেশমাতৃকার পায়ে নিজের জীবন অঞ্জলি দিয়ে নয়—যখন তিনি সংসার জীবনের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছিলেন তখনও—অর্থাৎ সমস্ত জীবন ভরেই। নিতান্ত গ্রাম্য অনাত্মীয় যে ছেলেটি (তুহিন কুমার দাস, গ্রাম ও পোঃ-কাপাসএড়্যা, মেদিনীপুর) কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দুচোখে উচ্চশিক্ষার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে, সে তো পরমাশ্রয় পেয়েছিল শ্রীসেনের সংসারে। স্ত্রী ও তিনটি মেয়ে নিয়ে স্থান অকুলান সংসারে সে পেল ঠাঁই। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনীও সেই ছেলেটিকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছিলেন মাতৃস্নেহে। মানুষ হয়ে, আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেই ছেলেটি কোনদিন ভোলেনি তার অতীতকে। আজও অনেক অসুবিধার মধ্যেও সে খোঁজ নেয় তার অনেকদূরের অনাত্মীয়, কিন্তু হৃদয়ের একান্ত কাছের সেই বোনদের, তাদের সামান্য

কিছু দিতে পারার আনন্দে আজও তার মুখমণ্ডল বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়।

পরবর্তীকালে প্রফুল্লকুমার ঘটনাচক্রে সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন; তবে সংসার তাঁকে সম্পূর্ণ বাঁধতে পারেনি, কোনদিনই সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বা উৎসাহ ছিল না। অথচ সেই মানুষটিকেই দেখা যেত অপরের যে কোন বিপদে প্রাণপাত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বয়সে নবীন সেই জেলবন্দী ছেলেটি যে অনেক আগেই ভালোবেসেছিল প্রবোধ সান্যালের ওই লাইনগুলি "আকাশের দিক্‌বলয় যখন সুবিস্তৃত হয়ে ওঠে তখনই বুঝতে হবে আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছি পাহাড়ে।" সকলদিকের দৃষ্টির বাধা যেন খুলে গেছে। জীবনেও এমনি। যখন সঙ্কীর্ণ চেতনার মধ্যে মানুষ বাস করে তখন তাদের মনের আকাশ অল্প-পরিসর, স্বল্প আয়তন, মানুষ যখন উদারতা ও মহত্ত্বের শীর্ষে উঠে দাঁড়ায় তখন দেখতে পায় তার হৃদয় ও দৃষ্টির প্রসারতা, পরিব্যাপ্তি। যাঁরা নিতান্ত আপনঘর নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরা সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যাঁরা আরো ঊর্দ্ধলোকে উঠেছেন তাঁরা হলেন বিশ্বের কল্যাণকামী, মহামানব, মহাত্মা।" সংসার বন্ধনের সাথে সমাজের সীমা অতিক্রম করে ঊর্দ্ধলোকে ওঠার কোথায় যেন একটা আপাত-অদৃশ্য বিরোধ আছে। তাই বোধহয় সাংসারিক জীবনে ধরা দেবার বিশেষ উৎসাহ তাঁর ছিল না।

মানব মনের একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও যুবক প্রফুল্লকুমারের মনে রেখাপাত করেছিল। "যার কাছে আঘাত পাই, যে করে তাচ্ছিল্য ও অনাদর, তাকে জয় করে করতলগত করবার জন্য মন যায় ছুটে। আবার যেখানে আমারই পদপ্রান্তে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আমাকে অবলম্বন করে যে বাঁচতে চায় তার প্রতি আমার নির্দয় অবহেলা, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য।" কথাগুলি মনে হয় বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই সত্য। "যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা চাই তাহা পাই না"র মধ্যেও এই একই বোধ ফুটে ওঠে। যে ঈশ্বরের জন্য আমাদের এত তীব্র আকুলতা, তার পিছনেও বোধহয় সত্যিই এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে—অন্ততঃ সেদিন কারাগারের অন্তরালে সেই যুবকটির এই উপলব্ধিই বোধহয় ঘটেছিল। তাই তাঁর চয়নে ধরা পড়ে "ঈশ্বর নাই কিংবা উদাসীন বলেই তাঁকে পাবার জন্যে মানুষের এতো আগ্রহ এতো ব্যাকুলতা। তিনি কথায় কথায় আমাদের করতলগত হলেই তাঁর মূল্য যেত কমে, মানুষের কামনা ও কৌতুহল যেতো থেমে।"

দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রফুল্লকুমার সেই সব অতীত ব্যবস্থা, যা দেশকে এতদিন ক্ষতিগ্রস্ত করে রয়েছে, সেইগুলির পরিবর্তন চেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে চিরদিনই দেবদেবী, পাপপুণ্য ইত্যাদির প্রাধান্য। দৈবর উপর নির্ভরশীলতা স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরে এই একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজও ধর্ম উদ্বুদ্ধ করে অপরের ধর্মে আঘাত করতে, সুস্থ জীবন বিসর্জন দিয়ে ধর্মের পতাকা তুলে মানুষে মানুষে হানাহানি, পরস্পরের প্রাণ নেওয়ার ভয়ঙ্কর হোলি খেলায় আজও মেতে ওঠে মানুষ। সুস্থ সমাজ, সুস্থ জীবন পেতে হলে অনেক পরিবর্তন দরকার পুরানো চিন্তা, ধর্ম ও ভাবধারার। তার পরিপ্রেক্ষিতে "মহাপ্রস্থানের পথে"র প্রতিলিপি করা অংশটুকু প্রফুল্লকুমারের মানসিকতার একটি দিক তুলে ধরছে—"মানুষের সহন প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও মস্তিষ্ককে আমরা তথাকথিত পাপ-পুণ্যের বিচার বোধের দ্বারা উৎপীড়িত করেছি—একথা কে না স্বীকার করবে, সহজ হয়ে বাঁচা, সুস্থ হয়ে বাঁচা যদি আমাদের কাম্য হয়, ...তবে আজ মন্দির, মসজিদ, গীর্জার দরজা বন্ধ করে দিতে হবে, বন্ধ করে দিতে হবে ধর্মধ্বনি ও নীতি প্রচারের বাণী।" মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হবে, তার জন্য দরকার অতীত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে ফেলা। কারাগারের অন্তরালে বসে সেই বোধ তাকে অনুপ্রাণিত করেছে—"মানবচিত্তের সকল বন্ধনকে খুলে দিতে গেলে প্রথমেই জগৎ সংসার থেকে এই religious institution গুলোকে ধ্বংস করা দরকার।" "চিত্তকে সংযত করতে (হলে) লেখার মতো বড় বল্গা আর নেই"—তাই বোধহয় প্রফুল্লকুমার কালির আঁচড়ে লিপিবদ্ধ করতেন বই এর পর বই এর অংশবিশেষ—তার নিজের ভালোলাগার অংশগুলি যার মধ্যে বাজে অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত দৃপ্ত চিত্তের রুদ্রস্বর—"অন্যায় ও অসত্যকে কেউ যেন মার্জনা না করে, সমস্ত সামাজিক মিথ্যাচার, নির্লজ্জ বর্বরতা, মানুষের কুটিলতা ও অবমাননা...এদের বিরুদ্ধে যেন সর্বনাশা ধ্বংসের সুর বাজে।"

অথবা সন্ন্যাসীর গীতির ২নং ও ৫নং গান দুটি প্রফুল্লকুমার যেগুলিকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কণ্ঠে ধরে রেখেছিলেন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

(২)

ভেঙ্গে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোনার নির্ম্মিত হলে কি দুর্বল,
হে ধীমান্, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙ্গ শীঘ্র-তাই ভাঙ্গ প্রাণপণে।
ভালবাসা ঘৃণা, ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব,
ত্যজহ উভয়ে; উভয়েই মন্দ।
আদর দাসেরে, কশাঘাত কর,

দাসত্ব-তিলক ভালের উপর;
স্বাধীনতা বস্তু কখন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু তো বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসী প্রবর,
দূর কর দুয়ে অতীব সত্বর;
কর কর গান, কর নিরন্তর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

(৫)

সত্য কিবা তারা জানে না কখন,
সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন—
পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব—
আত্মা তো কখন নহে এই সব;
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু, শত্রু কাহার ধীমান?
একমাত্র যেবা—যেবা সর্ব্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
'তত্ত্বমসি', ওহে সন্ন্যাসীপ্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

প্রফুল্লকুমারের জেলের খাতাটিতে যে চিঠিগুলির true copy রয়েছে তা তার স্পষ্ট, সুন্দর হস্তাক্ষরের পরিচয় দেয়। জেলে কাগজ সংকট। তাই খাতার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেছেন। এতটুকুও অপচয় হয়নি। জেলের কয়েকটি চিঠি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা থেকে জেলে অবস্থানের সময় এই বিপ্লবীর মানসিকতার খানিক আভাস মেলে।

যেমন পিতার মৃত্যুর পর ছোট বোন সুহাসিনীকে লেখা চিঠিটি যা থেকে জানা যায় তিনি লিখেছেন ১৫ বছর (১২+৩) দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ছিলেন। সম্প্রতি গভর্নমেন্ট ৩ বছর মকুব করে সাজা ১২ বছর বহাল রেখেছেন।

চিঠিটি লেখা ৭ই পৌষ শনিবার ৪৬ বাং ২৩শে ডিসেম্বর ৩৯ ইং।

True Copy

A Registered letter addressed to my younger sister Sm. Suhasini Mazumder. C/o. Late Father Babu Nabin Chandra Sen. P.O. Meahbazar, Vill-Ghashigram, Sen family. Dist-Tipperah, empowering her to do the needful about my father's "Sradha Ceremony" and to manage the left property of my Late beloved father.

কল্যাণীয়াসু। স্নেহের বোন সুহাস! কাল তোর চিঠি পেয়ে বিস্তারিত খবর জানতে পেলাম। ইতিপূর্বে ও মহেন্দ্র মামা তোর আর এক চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তোকে যে চিঠি লিখেছি আশাকরি এতদিনে তা পেয়েছিস। ঐ পত্রে বিস্তারিতভাবেই আমার মতামত লিখেছিলাম। বাবার শেষকৃত্যাদি সম্বন্ধে অটলবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী তোর ক্ষুদ্রশক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে কাজ করবি। এ বিষয়ে এখান থেকে আমার কিছু বলতে যাওয়া সমীচীন হবে না। তোর সাধ্যানুযায়ী তুই যা' করবি তাতেই আমার ঋষিতুল্য-সরল পিতার-আত্মার সদ্গতি হবে—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আমার মতো অবস্থায়, সন্তানের পিতৃকার্য্যে বা মাতৃকার্য্যে অসময় বলে কিছু নেই। যদি ইতিমধ্যে বা কোনদিন মুক্তি পাই, তখন আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোর সাথে পরামর্শ করে কর্তব্য করতে চেষ্টা করবো। তুই এখন যাহা করবি;তাই যথেষ্ট হবে। জেলে বিশেষ কিছু করা বর্তমানে সাধ্যাতীত, সাধ্যমত নিয়মাদি পালন করেছি।

আমার স্বর্গীয় পিতার শ্মশান কোথায়, পুরাণপুকুরের পশ্চিম পাড়ে না দক্ষিণ পাড়ে (মায়ের ধারে) জানাবি। এবং দয়া করে শ্মশানে বেদী বেঁধে ভালোরূপ চিহ্ন দিয়ে রাখবি যেন আমি দেখতে পারি ভালো করে। বাবার চিতাভস্ম একটী ভালো কৌটায় ভরে তাঁর হতভাগ্য ছেলের জন্যে রেখে দিবি কিছু। জীবদ্দশায় বাবার প্রতি কোন কর্তব্য করতে পারি নি। (তাঁর তিরোভাবের পর) ভবিষ্যতে যদি কিছু পারি—সেই আশায়।

জমির ধান সব আদায় করবি। কাজে যা খরচ হয়, বাকী সব বিক্রি করে ঋণ ধার যা আছে তা পরিশোধ করতে চেষ্টা করবি। বাবার অন্য কোন ঋণ যদি থাকে আমায় জানাবি। আমি পিতৃঋণ মাথায় তুলে নিলাম। মহাজনদের কাছে জানাবি—আমি মুক্তি পেলেই প্রথম পিতৃঋণ পরিশোধ করতে আত্মনিয়োগ করবো। কে কতো টাকা পাবে আমায় শুধু জানাবি দয়া করে।

বাবার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ আমি তোকেই দিচ্ছি। তুই

তোর ইচ্ছানুযায়ী ভালো যা' তাই করবি। কিন্তু একটী কথা ভুলোনা স্নেহের বোনটী আমার—আমাদের স্বর্গীয় পিতা নিজে অশেষ দুঃখকষ্ট সয়েও স্বেচ্ছায় সম্পত্তি নষ্ট বা বিক্রি করেন নি। সাধ্যানুযায়ী তিনি রক্ষা করে গেছেন। তুমিও আশাকরি উক্ত সম্পত্তি বিক্রি বা নষ্ট যাতে হয় তা করবে না। এ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ফলভোগ করতে তুমি পারো। বছরে একবার এসে ধানবিক্রি বা আবশ্যকীয়—সব বন্দোবস্ত করে যেতে পারো কিম্বা ইচ্ছা হলে এখানেও থাকতে পারো। বাবার ইচ্ছানুযায়ী আমি এসব আজ তোমায় দিচ্ছি। **জানতো আমায় ১৫ বছর (১২ + ৩) দ্বীপান্তর দণ্ড। সম্প্রতি গভর্নমেন্ট ৩ বছর মকুব করে আমার সাজা ১২ বছর বহাল রেখেছেন।** তন্মধ্যে ৪ বছর অতীত। বাকী প্রায় ৮ বছর কারাবাস করতে হবে। মুক্তি পেলে তোর পরামর্শ মতো যা ভালো তাই করবো। প্রতি বছর রাজকাছারীর খাজনাদি দিতে ভুলো না কিন্তু। এ সম্বন্ধে যদি প্রয়োজন বোধ করো বিশেষ, তাহলে অটলবাবুকে নিয়ে অথবা মহেন্দ্রমামার সাহায্যে এসে একবার আমার সাথে দেখা করে যেতে পারো। প্রয়োজন মনে করলে সঙ্গে মোক্তার নামা নিয়ে এসো—আমি এখান থেকে আমার নাম সহি (দস্তখত) করে দিয়ে দেবো। বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করলে এখন এসে অনর্থক খরচান্ত হওয়ার দরকার নাই কিন্তু।

দেবেন চক্রবর্তী ও হরেণ চক্রবর্তী যদি ইতিমধ্যে টাকা না দেয়, তবে সোজা অন্যদিকে না দেখে নালিশ করে দিও। আমার বাবা টাকার অভাবে কতো দুঃখকষ্ট পেয়ে গেছেন—সে কথা আমি ভুলবো না কিন্তু। অন্যথায় তাদের বাবার নাম, টাকা নেওয়ার তারিখ ইত্যাদি এবং দলিল তোর নামে না বাবার নামে, ইত্যাদি আমাকে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিও।

এইমাত্র আমি জেল অফিসে খোঁজ নিয়ে এলাম—কাশীনগরের সেজদার কোন তার, টেলিগ্রাম বা পত্র আমার নামে বা জেলের অন্য কোন সরকারী কর্মচারীর নামে এখন পর্যন্ত আসেনি। তিনি কোথায় তাঁর ওসব পত্র দিয়েছেন জানি না। তবে তাঁকে বলো—বাবা চলে গেছেন চিরবিদায় নিয়ে নীরবে। এখন অনর্থক টাকা পয়সা খরচ করলেও আর তাঁকে পাবো না। তিনি যেন বৃথা ব্যয় না করেন। কিরণের একপত্র শুধু পেয়েছি এবং তার সাথে সাথেই জবাব দিয়ে দিয়েছি। এখানে এসব গণ্ডগোল হবার কোন কারণই নাই। বড়দার ছেলেমেয়েদের ও তোর ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সজাগ আছি। সুযোগ মতো তা ভুলবো না। তোর ঋণ চিরকাল মনে থাকবে। বড়দার কথাও মনে রাখবো। আর যাঁরা নানাভাবে এই বিপদের দিনে তোর সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা ভুলবো না—কৃতজ্ঞ থাক্‌বো। বড়দা বাড়ী এসেছেন কিনা জানাবি। তুই অন্ততঃ প্রতিমাসে আমায় লেখবি এই শুধু

নিবেদন। বড়দাকেও মাঝে মাঝে লেখতে বলবি। বিশেষ কি। তোদের মঙ্গল কামনা করি।

ইতি
তোরই রাঙ্গাদা
প্রফুল্লকুমার সেন
২৩শে ডিসেম্বর ৩৯ইং
(৭ই পৌষ শনিবার)
১৩৪৬ বাং

Sent on (৯ই পৌষ সোমবার) 25th December, 1939

অপর চিঠিগুলির কিছুতে তারিখ উল্লেখ আছে কিছু চিঠি withheld হয়েছে। অশেষ নির্যাতনকালে স্বামী বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' অবলম্বন করে নীরবতাকে আশ্রয় করেছেন। গান্ধীজীর অনুসরণে পরবর্তীকালে জেলে তিনি সপ্তাহে তিনদিন মৌনব্রতও পালন করতেন।

একটি চিঠি "মা" দত্তপাড়া, নোয়াখালী চৌধুরী বাড়ীতে লেখা তারিখ ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ বাং ৩.৬.৪১ ইং মঙ্গলবার।

শ্রীচরণেষু। মা! কালকের খবরের কাগজে (The Statesman and The Azad) দেখতে পেলাম তোমাদের ওদিকে ভীষণ ঝড়-বন্যা হয়ে গেছে। তাতে বহুলোকের বহুপ্রকারের ক্ষতি তো হয়েছেই তাছাড়া বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে, আর যারা মরে নাই তাদেরও অবস্থা অতীব মর্মন্তুদ। আমার এ চিঠি পাওয়া মাত্র দয়া করে বিস্তারিত খবর দিও; বড়োই উদ্বিগ্ন আছি কিন্তু।

জানই তো মা। আমি বন্দী—তোমাদের এই দুর্দিনে এবং দেশের এই দুঃসময়ে কলমের ডগায় সাধারণ সহানুভূতি ও দুঃখপ্রকাশ ছাড়া—অন্য কিছু করার সুযোগ সুবিধা নেই। ব্যক্তিগত দুটো কথা বলেই এখন সমাপ্তি রেখা টান্‌বো।

১। হয়তো শুনেছ—ছোটবোন সুহাস তোমায় জানিয়েছে আজ প্রায় দু' বছর হতে চললো আমার বাবা দেহত্যাগ করেছেন। বহু চেষ্টা ও তাঁর অন্তিম আকুল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও শেষ সময়ে বাবার সাথে দেখা হয়নি। দেহত্যাগেরও প্রায় দুবছর আগে তিনি নিজে এসে আমায় দেখে গিয়েছিলেন জেলে; এবং ঐ শেষ দেখা।

২। বহুদিন পরে তোমায় ঐ চিঠি লিখছি। প্রথমে জেলে এসে আলিপুর হতে (বহুবর্ষ আগে) তোমাকে খানকয়েক চিঠি লিখেছিলাম; কিন্তু তোমার সাড়া পাইনি। তারপর এ ক'বছর নেহাৎ অভিমান করেই নীরব ছিলাম, উত্যক্ত করিনি ভুলেও তোমায়। তুমিও অবশ্য গত দশ বছরের মধ্যে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ

করনি—হয়তো "মা" বলেই। যাক্ প্রণাম নিও। অন্যান্য প্রণম্যদের প্রণাম দিও, ছোটদের দিও স্নেহাশিস্।

ইতি

প্রণতঃ তোমারই স্নেহসিক্ত প্রফুল্ল

এই চিঠিতে দেশের দুর্যোগে এই দেশপ্রেমিকের আত্মীয়বন্ধুদের জন্য উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। "দুঃসময়ে" কিছু করতে না পারার দুঃখকে "কলমের ডগায় সহানুভূতি" বলে তাই বর্ণনা করেছেন। জেলে এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪১ এর জুন মাসে বিপ্লবীরা newspaper পড়ার অনুমতি পেয়েছিলেন তাতে 'The Statesman' এবং 'The Azad' নাম দুটির উল্লেখ রয়েছে।

পিতার মৃত্যুর পর দুবছর অতিক্রান্ত। পিতা অশক্ত অবস্থায় কুমিল্লা জেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ঐ সাক্ষাৎ পিতাপুত্রের শেষ সাক্ষাৎকার। বৃদ্ধের পক্ষে দমদম জেলে এসে ছেলের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি।

তখন যে জেলে বিপ্লবীদের কঠোর আইনের জালে আবদ্ধ রাখা হত তার পরিচয় মেলে দীর্ঘ এক বছর মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে একমাত্র পুত্র শেষ দেখা বা পারলৌকিক কাজ করার অনুমতি চেয়েও পায়নি। মানবিক কারণেও যে এতটুকু আইন ব্রিটিশ সরকার শিথিল করেনি একথার উল্লেখ প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ের চিঠিগুলির তারিখ থেকে দেখা যায় একটি চিঠির সঙ্গে অপর চিঠির লেখার সময়ের ব্যবধান প্রায় ৪-৬ মাস। অর্থাৎ দীর্ঘ বন্দী জীবনে বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে চিঠি লেখার তাগিদও হারিয়ে ফেলেছিলেন। কারণ বহু চিঠি জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক withheld করা হত। নিম্নলিখিত চিঠিটি তারই প্রমাণ দেয়।

Letter to Sj Dhirendra nath Dutta M.L.A. withheld by the Police on 10.10 41

১৪ই আশ্বিন ৪৮ বাং

বুধবার ১.১০.৪১

শ্রীচরণেষু,

যদিও বহুবছর ধরে দেশছাড়া, সমাজছাড়া, তবু আজকের দিনে পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কথাই মনে জাগে—স্মরণ হয়। পরাজয়ের গ্লানি নিয়েও বিজয়ার প্রণাম ভালবাসা—আলিঙ্গন জানাতে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। সশরীরে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। তবু আশাকরি প্রতিভূ এই ক্ষুদ্রলিপি সস্নেহ আশীর্বাদ পাবে। বাসার সব পূজনীয়া ও পূজনীয়দেরও প্রণাম জানাবেন;আর ছোটদের দেবেন আশিস—ভালবাসা। দেশের সবাইকে (যথাসম্ভব) দয়া করে আমার যথাযোগ্য প্রণাম শ্রদ্ধা—ভালোবাসা জানাবেন।

ইতি

প্রণতঃ প্রফুল্ল

পুনঃ শুনে খুশি হবেন—জেলে আমাদের যে কাজ এখন কর্ত্তে হয়—তা হচ্ছে—সুতোকাটা। আজ সুতো কাটতে গিয়ে কেবলই মনে প্রশ্ন উঠছে বারবার—বিচিত্র বিজ্ঞানের যাদু মন্ত্রবলে অপূর্ব্ব যন্তর নিয়ে হন্তারক সেজে জগতের সভ্য মানব একে অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে Panzer corps, Luftwaffe, blitzkrieg নিয়ে শুধু কী কেবল Lebensraum এর জন্যে? না অন্য কোন মতলব আছে? একি বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থায় দন্তোদ্গমের পূর্ব্বের হামজ্বর ও বিকার? ঠিকমতো দাঁত উঠে গেলে ওগুলো কী জগতের হিতে শুভকাজে নিয়োজিত হবে? এসব কি মানবের দুষ্ট বুদ্ধির প্রেরণা না শুভবুদ্ধির নবজাগরণ? এর পরিণতি কি? আশাকরি স্নেহাশিসের সাথে এসবেরও জবাব পাবো ইতি—

২৯শে আশ্বিন '৪৮ বাং
১৬/১০/৪১ ইং
বৃহস্পতিবার

Post card to Sj Haradayal Nag
Chandpur, Nutan Bazar
Tipperah, withheld 18.10.41

শ্রীচরণেষু। বিজয়ার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন, বাসার অন্যান্য পূজনীয়দেরও প্রণাম নিতে বলবেন। ছোটদের জানাবেন স্নেহাশিস।

ইতি প্রণতঃ প্রফুল্ল

জেলের মধ্যে থেকে যে কয়টি পত্রের True Copy পাওয়া যায় তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

"শ্রীশ্রীমা"কে লেখা একখানা চিঠির নকল।

শ্রীচরণেষু। মা! তোমার স্নেহলিপি পেয়ে আরও প্রফুল্ল হয়েছি। একঘেয়ে দীর্ঘ, বন্দী জীবনে বাস্তবিকই বিশেষ বৈচিত্র্যময় এই চিঠিখানি।

মা! লিখেছো—তোমায় মনে পড়ে কিনা?

২। তোমার জন্য মনে কষ্ট হয় কিনা? ৩। বন্দীজীবন দুঃখের, তবু আমি নীরব থাকতে চাই কেন? ৪। মুক্তি পেলে সর্ব্বাগ্রে তোমার কোলে ফিরে যাবো কিনা? —ইত্যাদি কয়েকটি খেলো প্রশ্ন করেছো তোমার "নির্ব্বাসিত" পুত্র প্রবরকে।

উত্তর—সংক্ষেপে দিচ্ছি—সহজ সত্যি কথা বলার স্বভাব এখনও আছে মা, হারাইনি।

তাই পূর্বাহ্নেই নিবেদন—সহজ সত্যি কথা—রুক্ষ বলে, রুষ্ট হয়ে বেহুদা কষ্ট মনে নিও না মা।

১। তোমায় ভুলি নি মা। ভুলতে পারি না—ভোলা যায় না বলে!

২। প্রায়ই মনে পড়ে তোমায়। অবশ্য সব সময়ে নয়। যখন মনে পড়ে। —

ভাবি—আনন্দ-নিরানন্দ মিশ্রিত ভাবে। বিশেষ করে, আমারই বাল্যকালে আমাকে লক্ষ্য করে তোমার বলা কথা বা ভবিষ্যৎদ্বানী স্মরণ করি সশ্রদ্ধভাবেই। "তুমি বাবা বড়ো দুরন্ত ছেলে। কভু শাসনে শান্ত হওনি, আর সোহাগে ও ক্ষান্ত হওনি বাপু।" —এই কথা কয়টি প্রায়ই মনে পড়ে, ভেবে তৃপ্তিও পাই। তখন উত্যক্ত হয়ে বললেও কথা কয়টি খাঁটি ও সত্য।

মা! শুনে খুশিই হবে—আশাকরি; তোমার দুরন্ত ছেলে আজও যৌবনে দুরন্তই আছে। আজও সেই দুরন্ত "শাসনে শান্ত হয় না, আর সোহাগেও ক্ষান্ত হয় না।"

আশীর্বাদ করো মা—বাকী জীবনেও যেন আমাতেও আমার মতো তোমার শত সহস্র সন্তানেতে এই মায়ের ভবিষ্যদ্বানী সফলতা লাভ করে, ফলে! আমরণ যেনো মায়ের সম্মান অক্ষুন্ন রেখে যেতে পারি!

জরা এসে যৌবনকে গ্রাস করতে উদ্যত, প্রথা এসে প্রাণশক্তিকে আড়ষ্ট করতে চায় বা চাইবে, —তাই আশীর্ব্বাদ করো মা—কালবোশেখীর ঝড়ে যেন চির-নূতনের ডাক বুঝে চলি। প্রাণ যদি যায়—যাক্। তবু মান যেন হারাই না কভু।

(উদ্ধত) উদ্বত অন্যায়ের উদ্যত বজ্রমুষ্ঠি সর্ব্বদা অগ্রাহ্য করে সত্যের ক্ষুরধার দুর্গম পথে নির্ভয়ে একাকী হলেও যেন যাত্রা করবার শক্তি-সাহস অটুট্ থাকে।

প্রাণবন্ত যৌবন নিয়ে মরে বাঁচতে চাই। জরাগ্রস্ত হয়ে বেঁচে মরতে দিও না। বলো না মা কভু।

৩। বন্দী জীবন কে বলে দুঃখের? মোটেই তা আমি মনে করি না মা! ইহা বড়ো আনন্দের, আত্মপরীক্ষার ও শক্তি সঞ্চয়ের স্থান। ইহা গৌরবের। মহা—শিক্ষাগার কারাগার। তবে আমি নীরব থাকি কেন? —ইচ্ছা করেই। নিজেকে চিন্‌তে, যাচাই করতে বুঝতে, ভাবতে, শিখ্‌তে তৈরী হতে সুবিধা বলেই আমি নীরব থাকতে পছন্দ করি। ভালোবাসি।

আর দ্বিতীয়তঃ—আজকের দুনিয়ায় সরব সকলেই তাই—তার চাইতে বেশি কার্য্যকরী এই নীরবতা, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আমার। ইহা শক্তি যোগায়, সবল করে নয় কি?

৪। মুক্তি পেলে আগে কার কাছে যাবো? —মা! ইহা কি একটা মায়ের মতো প্রশ্ন হলো? ছেলেমানুষী প্রশ্ন নয় কি? ইহাতে তোমার মহিমা অক্ষুন্ন রইলো কি?

তবু উত্তর দিচ্ছি—যাঁর আকর্ষণ বেশি উদার, তাঁর কাছেই যাবো আগে। আর দ্বিতীয়তঃ তুমি মা বলেই, তোমার দাবী সবার ওপর ডাক বা আহ্বান, সবার আগে, —এই সঙ্কীর্ণ ভাব আশাকরি তোমাতে মা থাকতে পারে না।

আজ—তোমার আদুরে দুরন্ত ছেলেকে সবার তরে বিলিয়ে দাও। যদি সত্যি

করে মা হয়ে আনন্দ ও শান্তি পেতে চাও—তবে—বিলিয়ে দাও। সূতো ছেড়ে দাও। উড়তে দাও। মুক্তি দিয়ে মুক্ত হও। মুক্ত করো মা সবাইকে। উৎসর্গ করে উৎসাহ দাও—কৃপণ জাতিকে। পরিপূর্ণভাবে—বিলিয়ে দিয়ে সন্তানকে একান্তভাবে পেতে চেষ্টা করো।

৫। আমি কি নির্ব্বাসিত বাস্তবিকই? —সব সময়ে যদি তোমায় চিন্তায় ধরা দিই—তবে কোন শক্তি—আমায় নির্ব্বাসিত করতে সক্ষম? আমি নির্ব্বাসিত বলেই কি বেশি করে তোমাদের কাছে নির্ব্বাচিত হইনি? এই নির্ব্বাসন দণ্ড কি আমায় প্রচণ্ড করে তোলেনি? আবারও বল্‌ছি—ভুলো না মা তোমারই বলা কথা, তোমারই ভবিষ্যদ্বানী; কতো সুন্দরভাবে, তীব্রভাবে সত্য—"দুরন্ত ছেলে তুমি। শাসনে শান্ত হও না। সোহাগে ক্ষান্ত হওনা কভু! বাপু!"

মা! জয় তোমারই, গৌরব তোমারই; —আমি শুধু দুরন্ত সন্তান, নিমিত্তমাত্র।

তাই—আশীর্ব্বাদ করো— তোমার বাণী সফল হোক্

আমার মাঝে

তোমার বাণী সত্য হোক আমার

মাঝে।

তোমার বাণী সার্থক হোক সুন্দর

হোক

আমার মাঝে। সবার মাঝে।।

"বন্দে-মাতরম্"—

তোমারই

ছন্নছাড়া

ছেলেটি।

নিঃসঙ্গ জেল জীবনে প্রফুল্লকুমারের কাছে জন্মদাত্রী মা এবং দেশ 'মা' উভয়েই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। একটি শব্দের সাথে মিলিয়ে অপর একটি শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখাটি লিখেছেন। যেমন 'রুক্ষ', 'রুষ্ট', 'শাসনে', 'সোহাগে', 'শান্ত', 'ক্ষান্ত', 'আনন্দ-নিরানন্দ', 'উদ্ধত-উদ্যত', 'প্রাণ-মান', 'উৎসর্গ ও উৎসাহ', 'আনন্দ-শান্তি', 'মুক্তি-মুক্ত', 'নির্ব্বাসিত-নির্ব্বাচিত'। 'প্রফুল্ল' শব্দটির ব্যবহার রূপক অর্থে।

সুদীর্ঘ জেল জীবনে (১৯৩৫ এর ১৬ই জানুয়ারি গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং ১৯৪৬ এর ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত) সময় কাটাবার উপাদান ছিল বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বই।

জেলে বসে লেখা এই খাতাটিতে প্রফুল্লকুমার ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল

পর্যন্ত যে চিঠিগুলি পেয়েছেন তার একটি তালিকা, কোন বছর কার কার কাছে চিঠি লিখেছেন, ইন্টারভিউতে কে কে দেখা করতে এসেছেন তার একটি তালিকা। ঐখান থেকেই জানা যায় যে প্রফুল্লকুমারের পিতার সঙ্গে শেষ দেখা ৭.৪.৩৮ সালে বাংলা ২৪.১২.৪৪-এ কুমিল্লা জেলে, তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে প্রায় দেড় বৎসরের অধিক পিতার সাথে একমাত্র পুত্রের আর দেখা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনে জেলের কঠোর আইনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে দেখার অনুমতিও যে পাওয়া যায়নি তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

1938

1938 June Letter or P.C. Sent to :—

1. Post Card sent to Father on 13.6.38
2. Post card sent to Kiron on 1.7.38
3. Post card sent to Suhash on 18.7.38
4. Letter to Kiron and Chot-di on 2.8.38
   Interview with mama on 14.8.38
5. Post card to Barama on 15.8.38
6. Post card to Suhash and Father on 31.8.38
7. Post card to Chot-di and Kiron on 14.9.38
8. Letter to Suhash, Pradip & Father on 28.9.38

Bijaya Special

9. Post card to Father and Rabi on 6.10.38
   Interview with mama on 16.10.38
10. Letter to Kiron, Hiron and Chot-di on 26.10.38
11. Letter to Kiron, Hiron, Chot-di, Mejdi & Father on 10.11.38
12. Letter to Suhas, Atalbabu, Pradip & Ava on 28.11.38

1938 June Letter or P.C. received from :—

1. Post card from Suhash and Father on 2.6.38
2. Post card from Suhash and Father on 16.7.38
3. Letter from Father and Rabi on 16.7.38
4. Letter from Kiron on 30.7.38
   Interview with mama on 14.8.38
5. Post card from Father on 26.8.38
6. Post card from Suhash on 26.8.38
7. Letter from Chot-di and Kiron on 13.9.38
8. Letter from Suhash, Pradip & Father on 27.9.38
9. Spl. Letter from Kiron and Hiron on 5.10.38

10. Spl. Letter from Father, Suhash, Pradip & Ava on 9.11.38

11. Spl, Letter from Kiron, Chot-di & Mejdi on 9.11.38

এই খাতাটিতে প্রফুল্লকুমারের Weight Chart 1938-1942 পর্যন্ত পাওয়া যায়—

Height–5ft. 2.5inch

1938, 1939

Weight—

	4.6.38	2.7.38	4.8.39	13.8.39	1.10.39	7.1.40	11.8.40	1941	1942	1943
Weight—	125	125	109	116/118	123	120	117	118	129	118
Chest—	37.5	37.5	34	34.5	36	36	36	36	36.5	37
Waist—	29.5	29½	27	28	26.5	29.5				

Medicine list যা প্রফুল্লকুমার জেলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিয়েছিলেন তাঁর তারিখ অনুযায়ী একটি চার্টও পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে প্রফুল্লকুমার নিজের 'আত্মকথা'য় একথা উল্লেখ করেছেন "ব্রিটিশ পুলিশ জেল কোডে নেই সেই সব শাস্তি আমাদের দিয়েও কাবু করতে না পেরে বলেছিল Prafulla Kumar and Sitanath Dey (Inter Provincial Conspiracy Case এর leader) both are incorrigible."

জেলের সাথী এক সাধারণ কয়েদী বাবুলালকে নিয়ে লেখা প্রফুল্লকুমারের "কারাসাথী বাবুলাল" নামক লেখাটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Staff recreation club-এর ১৯৫৮ সালের সুভ্যেনিরে প্রকাশিত হয়। লেখাটি নীচে দেওয়া হল।

কারাসাথী বাবুলাল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন

স্থান—আলিপুর, কেন্দ্রীয় কারাগার। কাল—প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটীশ রাজত্বের শেষভাগ—বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমাংশ। পাত্র—কারাগারের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির (Hardened Criminal) কয়েদী বাবুলাল (২২ বারের সাজা খাটছে)। প্রতিদিনই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বিশ্রাম সময়ে জনৈক রাজনৈতিক দীর্ঘমেয়াদী বন্দীর সাথে সুখ দুঃখের কথা, জেলের অভিজ্ঞতার বার্ত্তা, জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী, সবিস্তারে বর্ণনা করে, তার নিঃসঙ্গ কারা জীবনের ভার লাঘব করতো।

কারাগার ও কারা জীবন এক অপূর্ব্ব জিনিষ। সেটা একটা আলাদা দুনিয়া। সেখানকার রীতিনীতি, আইনকানুন, চাল-চলন্, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ,

হাগা-মোতা, সাজা ইত্যাদি সবই আলাদা হবে এটা আন্দাজ করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু বাইরের স্বাভাবিক জীবনে ওখানকার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক কথা যথাযথভাবে ভাবা বা কল্পনা করা যায় না। যাক এহেন অবস্থায় রাজনৈতিক দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুর নিকট এই আলাপী কর্ম্মঠ, সরল-উদার বিনয়ী, প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, প্রৌঢ় অশিক্ষিত বিশ্বাসী বাবুলালের প্রয়োজন অত্যধিক। জেলের কয়েদী হতে সুরু করে সিপাহী শান্ত্রী, ডাক্তার, ডেপুটি জেলার, জেলার প্রভৃতি সম্বন্ধে বাবুলাল মূল্যবান খবর পরিবেশন করতো বন্ধুকে।

কারাগারের কঠোর সাজা খাটবার সময়ে বাবুলাল স্বেচ্ছায় কাজ বেছে নিয়েছিল—হাড়ি বা মেথরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করার মহান ব্রত গ্রহণ করার পেছনে ছিল একটু স্বার্থবুদ্ধি—দৈনিক ধূমপান করতে ৪টি বিড়ি দেওয়া হতো, একদলা পাঁকের বড়ির মত গুড়ের ডেলা, ৪ টুকরো মাংস ও সামান্য একটু সরিষার তেল যা' অন্য কোন কয়েদীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না, এবং এসব কারাগারে নিষিদ্ধ। ধূমপান নিষিদ্ধ বলেই জেলখানায় ওটা খুব বেশি করেই গোপনে প্রচলিত ছিল, বে-আইনীভাবে। আর এই ধূমপানের জন্যেই দেখা গেছে কারাগারের মধ্যে অনেক জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হতে। এই ধূমপানের লোভেই প্রলুব্ধ বাবুলাল স্বেচ্ছায় মেথরের কাজ গ্রহণ করে গোপন অপরাধ এর হাত এড়াতে পেরেছিল বলে গর্ব্ব করতো, বাস্তবিকই বাবুলাল মানুষ ছিল।

বাবুলালের সাথে সেই দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক কয়েদীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল, নানা কাজের মাধ্যমে। বাবুলাল মেথরের কাজ করে—অতএব উন্নাসিক দুবে, চৌবে, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী প্রভৃতি সিপাহী জমাদারের নিকট অস্পৃশ্য ছিল বলেই তাকে দিয়ে মূল্যবান খবরাখবর, জেলের অভ্যন্তরে নানা ইয়ার্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে পাঠাতে সুবিধা ছিল, এবং বাবুলাল স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে এসব ছাড়াও আরও অনেক দুঃসাহসের কাজ করে বন্ধুর সাহায্য করতো। ক্রমেই এসব বে-আইনী (কারাগারের) কাজের মধ্য দিয়ে উভয়ের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হল। নির্জন কারাবাসে বসেও অনেক অসাধ্যসাধন এই মূর্খ, সরল সাহসী উদার দরদী বন্ধু বাবুলালের মাধ্যমে হয়েছিল, যা' বহুদিনের পায়তাড়া দেওয়া, তৈরী স্বদেশী বন্ধুর দ্বারা সম্ভব হতো না।

একবার বাবুলাল তার বন্ধুর এক বিশেষ গোপনীয় পত্র অন্যত্র নেবার সময়ে বামাল জনৈক ইউরোপীয় সার্জ্জেন্টের হাতে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল—সেবার এই পত্রের জন্যে তার ওপর যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব ও অচিন্ত্যনীয়, কিন্তু বাবুলাল দৃঢ় ও অনমনীয়। কিছুতেই

পত্রলেখকের ও প্রাপকের নাম সে প্রকাশ করেনি। এই পত্র নিয়ে কারাগারে বিরাট হুলুস্থুল পড়ে যায়—সবাই তো ভেবে অস্থির বাবুলাল কোন্ কথা বলে কাকে জড়ায়। কিন্তু অশিক্ষিত বাবুলাল আল-অটল ও অবিচলিত। বারবার ঐ একই কথা "কাগজখানা বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, ঘুড়ি বানাবার সখ ছিল। এতে কী আছে জানি না, বুঝি না, আমি মুখ্যু শুখ্যু লোক।" কিছুতেই বাবুলাল টলে নি, নানা প্রলোভনেও না। এর জন্য বাবুলালের জেলজীবন আরও দীর্ঘতর হয়েছিল। বাবুলালের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও তারই সাথে সরকারের উপর। তাই স্বদেশী কয়েদী বন্ধু তাকে ভাবীকালের বিপ্লব প্রচেষ্টার বিশ্বাসী হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম বন্ধু সচরাচর মেলে না। দুঃসাহসী, দৃঢ়চেতা বাবুলাল অনেককেই লজ্জা দিতে পারে—তার উদারতায় ও ত্যাগ সংযমে। অক্ষরজ্ঞানহীন বাবুলাল—একটা বিরাট বিস্ময়। এককথায় বাবুলাল পরমবন্ধু ও বিশিষ্ট শিক্ষক।

বাবুলাল প্রথম জীবনে সঙ্গদোষে প্রথমবার জেলে এসেই দলে ভিড়ে যায়, তারপর দলনেতার আদেশে অনেক অসাধ্যসাধন করে বারবার জেল খাটে। এইবার নিয়ে সে ২২বার জেলে এসেছে এবং যৌবন শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেও তার ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই যাত্রার। দলীয় কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে সে চার-চারটে বিবাহ করেছে, বহু সন্তানের সে পিতা, স্ত্রীগণ তার দলীয় কাজের সহায়ক ও তত্ত্বাবধায়ক। আপদে-বিপদে তারা পাশে এসে সুবিধামত দাঁড়ায় ও অংশগ্রহণ করে। বউগুলোর সবই ভাল, তবে অভাবে পড়ে খেতে না পেয়ে মাঝে মাঝে মাথা বিগড়ায় ব'লে সবাই একত্র হয়ে বাবুলালকে বেদম প্রহার করে—পুলিশের মার সহ্য হয়, সাধারণের মারও অসহ্য নয়, কিন্তু স্বামী হয়ে স্ত্রীলোকের মার বা জেনানার মার নাকি অসহ্য তার কাছে। তাই একবার সব ছেড়ে সে সন্ন্যাসী হবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল কিন্তু সর্বজ্ঞ গুরুদেব সব শুনে তাকে ধরে ত্রিনাথের মেলায় এনে, মহামন্ত্রের সাথে এক মহৌষধি পান করিয়ে সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। তদবধি সে সেই মহৌষধি নিয়মিত পান করে, বাবা ভোলানাথ বনে যাচ্ছে। গুরুজীর কাছে বহুবার জেনেছে—মহাদেবেরও কালী, দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতি বহু স্ত্রী। কেউ বুকে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে, কেউবা মাথায় চড়ে ফুৎকার দিচ্ছে। নানা অভাবে অনটনে ব্যাটা প্রায় অর্ধ উলঙ্গ, মহৌষধি টেনে বিভোর হয়ে কভু ধ্যানস্থ হন, কভু তাণ্ডব নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কাপান—বম্‌বম্ করে বগল বাজান; শক্তিধর শিবনাথ সেই অপূর্ব্ব কলকের গুণে। বাবুলাল গুরু কৃপায়, তাঁরই ধারক ও বাহক। সরল বিশ্বাসী বন্ধু বাবুলাল সেই মহৌষধির গুণেই তো জেলের সেদিনের

সেই অত্যাচারের কালকূট বিষ হেলায় হজম করতে পেরেছিল। নমস্কার, সেই শক্তিধর নীলকণ্ঠ দরদী বন্ধু বাবুলালকে।

বাবুলাল চোর, ডাকাত, পকেটমার, নামজাদা গুণ্ডা হলেও সে মানবপ্রেমিক। পরিশ্রম করবার শক্তি তার খুব বেশী বলেই তথাকথিত শিক্ষিত আত্মসর্ব্বস্ব বুদ্ধিমান লোকের মত সে হিসেবী নয়, সবদিক দিয়েই বেহিসেবী, তাই তো এবার মুক্তি পাবার পূর্ব্বদিনে সে যখন তার স্বদেশী বন্ধুটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এল, তখন ভাবের আবেগে সে কেঁদে ফেললো এবং তার অমূল্য ধন, সেই গুরুজীর দেওয়া ত্রিতাপনাশক গাঁজার কলকেটি দুই ছিলিম শেষ সম্বল গাঁজাসহ তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে অকুণ্ঠচিত্তে দান করে বসল, শুধু বলে গেল "বাবুজী সকালে বিকেলে রোজ দু'বেলা যদি দু'ছিলিম চড়াতে পার, তবে দীর্ঘ জেল-জীবন কোন্ পথে পালাবে টেরও পাবে না। খবরদার এ সম্পদ আর কাউকে দিও না, আমার কথা মনে রাখবে এই কলকের গুণেই। তোমার কথাও মনে রাখবো, ছোটলোককে বুকে টেনে বিদায়বেলায় যে চুমু খেলে তাতেই আমি পাগল হয়ে গেছি, এমন করে কেউ তো কাছে বা বুকে টেনে নেয় না, এসব কুকর্ম্ম ছেড়ে দেবো বাবুজী, দেশ স্বাধীন হলে যদি এসব গরিবদের পেটভরে দু'বেলা খাবার দিতে পার। তোমরা তা' নিশ্চয় পারবে যদি বেদরদী বড়লোকদের গদীছাড়া করতে পার। এসব শিক্ষিত জেলার সুপার (সুপারিন্টেডেন্ট) প্রভৃতি বড়বড় মাইনে নেওয়া চোরদের হঠাতে পার— এরা মাইনেও বেশি নেবে, আবার ঈর্ষা করে গরিব চোর ডাকাতের সামান্য খাবারের উপরও দৈনন্দিন চুরি চালাবে।" আবেগভরে বাবুলাল আরও কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রণাম করে সজল নেত্রে খালাসী ফাইলে চলে গেল। পরদিন যথারীতি থানায় হাজিরা দেবার কড়ারে সে মুক্তি পেল, কিন্তু তার বন্ধু আজও মুক্ত হয়নি। এখনো দেশে গরিবের হাহাকার রয়েছে।

বাবুলালের দেওয়া সেই গাঁজার কলকেটি প্রফুল্লকুমার সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিলেন। তার কন্যারা ছোটবেলায় বাবার নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে খেলবার কৌতূহলে তা নষ্ট করে ফেলে।

অবশেষে মুক্তি—১৯৪৬ সালের ৩০শে আগস্ট

১৯৪৬ সালের ৩০শে আগস্ট রাত্রি ৮টায় প্রফুল্লকুমার আলিপুর জেল থেকে মুক্তি পান। এইসময় তাঁর বয়স ৪১ বৎসর। জেল গেটে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, চারুচন্দ্র রায়, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির সঙ্গে বিপুল জনতা সাগ্রহে এই বিপ্লবীদের বরণ করেন।

ফুলের মালায়, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে তখন চতুর্দিক মুখরিত। জেলের অদূরে ময়মনসিংহের জমিদার স্নেহাংশুকান্ত আচার্য চৌধুরীর বেকার রোডের বাড়ীতে এই বিপ্লবীদের নিয়ে যাওয়া হয়। প্রফুল্লকুমারের নিজের কথায় "দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি কি অপূর্ব উল্লাস!" কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ এর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় সমগ্র হিন্দু-মুসলমানে direct action-এর দৌলতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক হাজার লোক নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।

প্রফুল্লকুমার এরপর কলকাতা থেকে কুমিল্লায় যান। "পিতৃহীন আমি শূন্যগৃহে, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে সপ্তমী পূজার দিন হাজির হলাম।" বিপ্লবী প্রফুল্ল সেনকে জেল থেকে মুক্তির পর কুমিল্লার টাউন হলে এক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সম্বর্ধনার খবর একটি তারিখ বিহীন লিফলেটে পাওয়া যায়। সময় ছিল অদ্য ৬।। ঘটিকা লিফলেটটি নিচে দেওয়া হল—

বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন
সম্বর্দ্ধনা সভা

স্থান—টাউন হল

সময়—অদ্য ৬।। ঘটিকা

বন্ধুগণ!

দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের পর টিটাগর ষড়যন্ত্র মামলার নেতা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে সহরবাসীকে দলে দলে টাউন হলের সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি

নিবেদক—

নিবারণ ঘোষ — স্বর্ণকমল রায়
অতীন্দ্র রায় — শরৎচন্দ্র ভরদ্বাজ
নেপাল নাহা — আশুতোষ সিংহ
অনন্ত দে — নিবারণ চক্রবর্ত্তী
রাখাল দাস — সুধা ভট্টাচার্য্য
দীপ্তি ভট্টাচার্য্য

ফাইন আর্ট প্রেস, কুমিল্লা।

বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন সম্বর্ধনা সভা

স্থান—টাউন হল

সময়—অদ্য ৬।। ঘটিকা

বন্ধুগণ!

দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের পর টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার নেতা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইতে শহরবাসীকে দলে দলে টাউন হলের সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

নিবেদক—

নিবারণ ঘোষ	স্বর্ণকমল রায়
অতীন্দ্র রায়	শরৎচন্দ্র ভরদ্বাজ
নেপাল নাহা	আশুতোষ সিংহ
অনন্ত দে	নিবারণ চক্রবর্তী
রাখাল দাস	সুধা ভট্টাচার্য্য
	দীপ্তি ভট্টাচার্য্য

ফাইন আর্ট প্রেস, কুমিল্লা।

লিফলেটটি ছাপা হয়েছিল ফাইন আর্ট প্রেস, কুমিল্লা।

সপ্তম অধ্যায়
গান্ধীজী ও প্রফুল্লকুমার

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয় গুজরাতে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। এইখানে আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে পরিচিত। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তিনি আখ্যা দেন সত্যাগ্রহ।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন। এইবার শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের সমর্থনে, আমেদাবাদে সূতীকল শ্রমিকদের সমর্থনে, খেদা অঞ্চলের কৃষকদের জন্য তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সফল হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এই পর্ব পর্যন্ত গান্ধীজী কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবুও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর দক্ষতা বারেবারে প্রমাণিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন আহ্বান করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজনীতি ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম গতিশীল হয়ে ওঠে।[৫৪]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে কলকাতায় সমগ্র হিন্দু মুসলমানের direct action-এর দৌলতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক হাজার লোক নিহত হয়। ধীরে ধীরে সেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর রাতে নোয়াখালী জেলার পল্লীগ্রামে ঘটে এক বীভৎস নারকীয় ঘটনা। (এর উল্লেখ প্রফুল্লকুমার 'আত্মকথা'তেও করেছেন) এই বর্বরতার শিকার হয়েছিল শ'খানেক গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ। "পাঁচদিন ধরে অব্যাহতভাবে ঘটতে থাকে নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও অপহরণ, জোর করে ধর্মান্তকরণ প্রভৃতি। আক্রমণকারী পক্ষ ছিল মুসলমান আর আক্রান্ত পক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।"[৫৫]

১০ই অক্টোবর এক স্থানীয় মুসলিম নেতার নেতৃত্বে জেলার হিন্দু মহাসভার

সভাপতি রাজেন রায়চৌধুরীর করপাড়া গ্রামের বাড়ী আক্রান্ত হয়। পরিবারের ১৫জন সদস্য সহ তিনি নিহত হন। প্রফুল্লকুমারের পিসতুতো ভগিনীপতি সীতানাথ নারায়ণ চৌধুরী সহ আটজন চৌধুরী বাড়ীতে এই নারকীয় দাঙ্গায় নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন। এই দাঙ্গায় অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। একমাত্র নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন রায় ছাড়া আর কেউ বাধা দিতে সাহস পায়নি।

নোয়াখালী দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গভর্ণমেন্ট যখন শান্তি স্থাপনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী পাঠায় ততদিনে দাঙ্গা খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। তবে লোক চলাচল শুরু হয়নি। স্থানে স্থানে রিফিউজী ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে এমন সময় মহাত্মা গান্ধী সদলবলে দত্তপাড়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন তাঁর নাতনী মনু গান্ধী, নাতবৌ আভা গান্ধী, প্যারিলাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বিভিন্ন সংবাদপত্রের দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিরা। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন একটি করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে ঘুরবেন এবং একরাত্রি সেখানে বাস করবেন। ৭৮বৎসর বয়সে শীতকালে তিনি খালি গায়, খালি পায় প্রত্যেকদিন সকালে এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে যেতে শুরু করেন। তাঁর গ্রাম পরিভ্রমণের সময় সঙ্গে থাকত প্রায় দুই'শ লোক। প্রত্যেকদিন বিকেলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে প্রার্থনাসভা হত। দুষ্কৃতকারীরা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। অবস্থার উন্নতি ঘটে।[৫৬]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে প্রফুল্লকুমারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ঃ

প্রফুল্লকুমার কলকাতা থেকে মুক্তি পাবার পর কুমিল্লায় যান সপ্তমী পূজার দিন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কুমিল্লার ঘাসিগ্রাম এবং আশেপাশের জনগণ, স্থানীয় মুসলমান নেতাগণ জমিদার কালামিঞার নেতৃত্বে সংযত ছিলেন। প্রফুল্লকুমার গ্রামে ফেরার পর তিনি তাঁকে সঙ্গে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জনতাকে শান্ত রাখার প্রচেষ্টা চালান। ফলে শুধু ঘাসিগ্রামেই নয় আশেপাশের কোন গ্রামে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি—এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এরপর প্রফুল্লকুমার নোয়াখালী যান। গান্ধীজী সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেছেন,—"গান্ধীজী এই দাঙ্গায় প্রলেপ দিতে নোয়াখালীতে আসেন। তাঁর সাথে আট মাস থেকে নোয়াখালীতে দেখেছি কেন কবিগুরু তাঁকে 'মহাত্মা' নামে ভূষিত করেছেন। মাঝে মাঝে গ্রামে ঘোরার সময় বীভৎস দৃশ্য ও নারকীয় ঘটনা দেখে মহাত্মাকে ধৈর্য হারিয়ে দু'চার কথা বলেছি। ধৈর্য সহকারে সব শুনে শান্তভাবে

প্রত্যেকটি কথার তিনি উত্তর দিতেন।" তিনি বলতেন, —"প্রকৃত শক্তি একতায় নিহিত। শত্রুপক্ষ (বিদেশী শাসক) মুষ্টিমেয় লোক দিয়ে আমাদেরই মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আক্রান্ত হবার সময় রুখে দাঁড়ালে এত নারকীয় ঘটনা ঘটত না। বাধা পেলে আক্রমণকারীরা পালাত।" নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সঙ্গে আটমাস শীর্ষক একটি লেখা শতাব্দী নামক কংগ্রেস শতবার্ষিক স্মরণিকায় ছাপা হয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) "গান্ধীজী চৌমুহনী হয়ে নোয়াখালী পৌঁছান ৭ই নভেম্বর। তাঁর পদব্রজে পল্লী পরিক্রমা শুরু হয় ২রা জানুয়ারি ১৯৪৭। অভিযান শেষ হয় ১লা মার্চ।"[৫৭]

একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠিত হয়েছিল ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণ কাজের প্রয়োজনে। গান্ধীজীর উপস্থিতির কারণে নোয়াখালী সেই সময় হয়ে উঠেছিল ভারতের অস্থায়ী রাজধানী। তখন তাঁর অসংখ্য দলমত নির্বিশেষে অনুরাগী কর্মীদের একজন ছিলেন প্রফুল্লকুমার। মহাত্মার সঙ্গে তোলা প্রফুল্লকুমারের সেই সময়কার একখানি ছবি পাওয়া যায়।

গান্ধীজীর সাথে প্রফুল্লকুমার

বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণে অংশগ্রহণ করেছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা, প্রবর্তক সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, ন্যাশনাল রেডক্রস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, মারোয়ারি রিলিফ কমিটি ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (RSP) (Revolutionary Socialist Party).

প্রফুল্লকুমার Bengal Evacuees' Relief কমিটির Habiganj, Sylhet শাখার

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রফুল্লকুমারের সংগ্রহে সেই সময়কার বিভিন্ন কাগজপত্র যার মাধ্যমে দাঙ্গা রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা পাওয়া যায়।

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিজ্ঞপ্তি (বিমান হইতে বিতরিত)।

২। নোয়াখালীর উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ও নির্ভীকতার মিশন—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর আহ্বান ২১.১০.৪৬।

৩। গুণ্ডাশাহীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ—প্রতিরোধের আহ্বান।

রিভলিউশ্যনারী সোশ্যালিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৫ বর্ষ ৩৩৮ তম সংখ্যা, কলিকাতা। বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল

Ananda Bazar Patrika

(with which the "ABRIDGED ANANDA BAZAR PATRIKA is incorporated)

Thursday, February 27, 1947 (শেষ সহর সংস্করণ)

গান্ধীজী বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধী

....

....

রাজনৈতিক কর্মীদের সহিত আলোচনা (স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৬শে ফেব্রুয়ারি গতকল্য.............................

....

....

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত প্রফুল্ল সেনের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর বিশেষ জোর দেন। শ্রীযুত সেন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা, টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ১৫ বৎসর দণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রকাশ, এখানে যাঁহারা জেলে আছেন, সেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির জন্য শ্রীযুত সেন গান্ধীজীকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী বিশেষ সহানুভূতির সহিত সমস্ত শ্রবণ করেন এবং উত্তরে বলেন যে, তিনি কখনও তাঁহাদিগকে ভুলেন নাই। ত্রিপুরার এই অঞ্চলে শ্রীযুত সেন সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন জানিয়া গান্ধীজী তাঁহাকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে নির্দেশ দেন।

....

....

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

ভারতে এখনও আয়ারের মত অবস্থার উদ্ভব হয় নাই

বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের বিহারে ফেরত পাঠাইবার দাবী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনার দ্বিতীয় দিবস

গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজ

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৩ সাল ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৪৭

গান্ধীজীর সঙ্গে আটমাস কাজ করার কথা প্রফুল্লকুমার তাঁর 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার এই সংবাদটিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গান্ধীজী তখন ত্রিপুরায় হৈমচর ছিলেন। এর পরবর্তী পর্যায় তিনি কুমিল্লায় যান। উপরোক্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আরও একটি তথ্য পাওয়া যায় যে, ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেতেও গান্ধীজী বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

সমাজসেবামূলক কাজ

R.S.P.I. দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মীরূপে প্রফুল্লকুমারের কার্যাবলী :

জেলের থেকে বাইরে এসে প্রফুল্লকুমার R.S.P.I. দলে যোগদান করেন। তিনি নিজের মুখে বা 'আত্মকথা'য় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর তৎকালীন ঠিকানা জানা না থাকায় R.S.P.I. দলের কলকাতা অফিসের ঠিকানায় প্রফুল্লকুমারের কাছে লেখা কয়েকটি চিঠি এবং R.S.P.I. দলের Central Committee-র মীরাটে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ যোগদানের ১.১০.৪৬ তারিখে পাঠানো একটি চিঠি পাওয়া গেছে। এছাড়াও R.S.P.I. দলের কমরেড নেপাল নাহার একটি চিঠি যা To Com. Prafulla Sen, Incharge, Ibrahimpur Zone ৫.৩.৪৭ তারিখে সই করেছেন পাওয়া গেছে। প্রফুল্লকুমারের কয়েকদিনের দিনলিপির [৬ই জুলাই ১৯৪৭ থেকে ১৯শে জুলাই ১৯৪৭ পাওয়া গেছে] বিভিন্ন স্থানে তিনি ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে জেলের বাইরে বেরিয়ে এই বিপ্লবী R.S.P.I. দলের একজন সক্রিয় কর্মীরূপে কাজ করেছিলেন এবং ঐ দলের ইব্রাহিমপুর জোনের দায়িত্বে ছিলেন। চিঠিগুলির অনুলিপি দেওয়া হল।

দাঙ্গা পরবর্তী পর্যায়ে প্রফুল্লকুমার সেনের কার্যকলাপ :

যা তাঁর কয়েকদিনের লেখা ডায়েরি থেকে পাওয়া যায় পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হল। পার্টির মিটিং-এর কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে।

Tuesday 4.3.47
President elected–Com. Praphulla Sen
Speakers :
.Com. Nepal Naha, Secy. Dist. R.S.P.I
Com. Brojen Chakravarty
Com. Nikhil Das, Labour-Leader
Com. Brojen Chakravarty, Secy. Sub-divisional
Com. Haricharan Dey, Krishan-R.S.P.I Leader.

Wednesday 5.3.47–21.11.53 B.S.

Arrived Chaltatali of Sapleza via Ibrahimpore. Informed all members and workers through Kalipada Babu (Das) and mani to attend a meeting at 4½ p.m. waited upto 6 p.m. only a few present and delivered a lecture. They agreed to meet twice a week and to manage every thing. Captain of the V.Corpse promised to do his duty regularly. For the last few days there were no parade and work, they say it is due to the negligence and inefficiency of the guardians and captain. Social quarrel is also responsible. ....of........ Dr. Satya Dutta and Atul Dutta, Ramesh Babu etc. are deviating from the main body.

Went to Ibrahimpore just at 7 p.m. but nobody was found, waited upto 8.30 met a few members exerted my point of view and lectured to them, requested them to join and efficiently manage the tomorrow meeting. Returned to Chaltali at about 10.30p.m. and found Com. Atul Dutt there.

Thursday 6.3.47–22.11.53 B.S.

Com. Atul Dutt and Dali departed for Chandpore and requested me to inform Makhanbabu to see them at Chandpore positively on 8.3.47 saturday visited the houses of the villages–Harina, Chaltatali, Kaunia and...delivered several lectures to in the classes of workers. In the evening presided over a meeting and delivered another lectures at N.Ibrahimpore, Akhaura ground. Com. Haricharan Dey, Nepal Naha, Nikhil Das, Bibhuti Dasgupta etc. also spoke.

যে খাতাটিতে তিনি এই দিনলিপি লিখেছেন তার উপর নিজের নাম লিখে লিখেছেন Praphulla Kumar Sen, Class–Infant, Subject–Kheyal.

আমাদের দেশে বিশেষ কোন উপন্যাস নেই। নেই কেন? তার কারণ, আমাদের জীবনে বৃহৎ শিক্ষা ও বৃহৎ দুঃখ একসঙ্গে এখনও আসে নাই। সুশিক্ষিত মন দুঃখের আবেষ্টনীতে পড়িলে, তবে বৃহতের দর্শন পায়। আমরা এখনও সুশিক্ষিতও হই নাই এবং চরম দুঃখও এখনও আমাদের জীবনে আসে নাই।

Dostoyevesky, Charles Dickens অথবা Maxim Gorky—আবির্ভাবের জন্যে আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে। সৌখীন দারিদ্র্যের অভিনয় করিয়া বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। আমরা সাধারণত উপন্যাস বলিয়া পড়ি ও লিখি তাহা বড় ছোটগল্প মাত্র। উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৃহত্ত্ব তাহাতে নেই।

6th July, 1947, ২১শে আষাঢ় ১৩৫৪ বাং, রবিবার—কুমিল্লা হতে ফেনীতে আসি। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত, কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি। ছাতার অভাব বিশেষভাবেই অনুভব করি। থাকা ও খাবার-স্থানবিশেষ অসুবিধাজনক। জামাকাপড় ও তৎসঙ্গে স্বীয় দেহখানা ভিজে চপচপ করছে। নিরুপায় হয়ে বিলনীয়ায় আশ্রয় নেই। সেখানে পঁহুছে স্বস্তি পাই।

7th July 1947, ২২শে আষাঢ়, সোমবার—আজো প্রবল বর্ষা হয়। বেরুনো দায়, ছাতা না কিনলে আর চলে! সুযোগ পেলেই এবার ছাতা কিনবো। চেষ্টা করেও ছাতা পাওয়া গেল না। তবু বাজারে যাই। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে বাজার খরচ করি। মনোমত দাম পাইনি।

8th July 1947, ২৩শে আষাঢ়, মঙ্গলবার—জনৈক বন্ধুর সাহায্যে বাজার খরচ করি। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে বড়ো অসুবিধা ভুগতে হয়। যাক্ নিরাপদ আশ্রয়স্থলে হাজির হই, অবশেষে।

9th July 1947, ২৪শে আষাঢ়, বুধবার—বৃষ্টির দরুন আজও রওয়ানা হওয়া গেল না। স্থানীয় কংগ্রেস আফিস ও তৎসংলগ্ন শিল্পকুটীর পরিদর্শন কবি। সমাজতন্ত্রী কর্ম্মীদল এখানে কাজ কচ্ছেন। সর্ষের তেল, চরখায় সুতো, তাঁতের কাজ ও মেয়েদের শিল্পশিক্ষা দেওয়ার দিকে এঁরা মন দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। খরচের মাত্রা আয়ের চাইতে অনেক বেশি, লক্ষ্য করলাম। বাইরের বড়ো সাহায্য নিয়েই চলে মনে হলো। এভাবে বেশিদিন চলে না।

জনৈক কংগ্রেস নেতার (ভূতপূর্ব্ব এম.এল.এ ও বর্তমানে আবার কংগ্রেসী টিকিটে নির্ব্বাচিত) পুত্রের অনুরোধে বিলনীয়ায় তার নব-ক্রীত জমিখণ্ড দেখবার জন্য সকালে যাই। ৪/৫ কানি বা বিঘা সুন্দর পছন্দসই উচ্চভূমি নামমাত্র খরচে রেখে সেখানে বাড়ী পুকুর ও বাগান তৈয়ারীর কাজ ধীরে ও সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছে। পুত্রটির কর্তব্য, দায়িত্বজ্ঞান ও স্বার্থজ্ঞান বেশ প্রখর। তার নামেই এসব জমি রাখা হয়েছে এবং স্বয়ং তদারক করছে। কংগ্রেসী ভাবাপন্ন হলেও স্থানীয় কর্ম্মিগণের সাথে তার মতবিরোধের কথা বলতে বিন্দুমাত্র ও দ্বিধা করেন নাই। তিনি সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রী কর্ম্মিগণের কাজ পছন্দ করেন না। আবার বিপ্লবী কর্ম্মতালিকা ও সময়োপযোগী বলে মনে করেন না। যাক্ তার সাংসারিক কার্য্যের বা বৈষয়িক বুদ্ধির চিহ্ন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে, হৃষ্টমনে দেখান ও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। আমি প্রায় নীরবেই সব দেখে যাই। মাঝে মাঝে দু'একটি প্রশ্ন করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করি।

10th July 1947; ২৫শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—সামান্য বর্ষার মধ্যেও যাত্রা করি, কিন্তু জীবনে এই প্রথম ট্রেন ফেল করি। তাও সঙ্গীর দোষে। দুপুরের (৩টায়)

ট্রেনে গেলে অসুবিধা হয়, বলে কাল-যাওয়া স্থির করি। বিকেলে স্থানীয় গ্রামগুলো ঘুরে দেখি ও দঃগ্রামের কংগ্রেস আফিসটিতে যাই। এখানেও পূর্ব্ববৎ সমাজতন্ত্রী কর্ম্মিগণের কর্ম্মস্থল। ছোট একটি স্কুল চালানো হচ্ছে, খবরের কাগজ উক্ত আফিসে সন্ধ্যায় মূল আফিস, ঘুরে আসে। স্থানীয় লোক চাঁদা দিয়ে ব্যাটারী খরচ জোগায় বলে, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এখানে রেডিওর সাহায্যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। গানের দিকেই গ্রাম্য লোকের টান বেশি থাকার কথা কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে খবরের জন্য লোকসমাগম দেখে প্রীত হই। রেডিওটা এদের নিজস্ব নয় বলে, এরা অভাবের কথা জানিয়ে দুঃখ করেন। রাত্রি ৯//. টায় আশ্রয়স্থলে সদলবলে আসি। আলাপাদি করে বিছানায় এলিয়ে পড়ি একটায়।

5.7.47–Received Rs. 100/- only one hundred from com. J.C.Chakravorty for com. Haricharan Dey to make over the said amount to him Rs. 100/-

6.7.47–Sunday to 12.7.47 + Riksha fare Rs/ 6/-, Train fare from Comilla to Feri Rs/ 12/-, Train fare from Feni to Belonia Rs./ 4/ 6, Newspaper (H.Standard) one copy on 2/-, Spent for...Articles, 7.7.47 Coole or Bearer Rs/ 8/-, Cart fare /6/-, Belonia to B.Baria train fare Re 1/12/-, Coole Fare Rs/ 4/-, Carriage fares B.B. to Gokarna 8/-, Stream Lanch fare upto Nab/ 8/-, Cooli fare (Nabinagor) /2/-

7.7.47–Received Rs. 10/- only for my travelling expenses to do Party work in the Nabinagor and Shyamagram areas Rs. 10/-

13.7.47–Washing soap 3/-, Post card 2/-

17.7.47–Bread etc. 4/6

11th July 1947, ২৬শে আষাঢ়, শুক্রবার—সকালের ট্রেনে যাত্রা করে নানা অবস্থার মধ্যে সন্ধ্যায় নবীনগরে এসে পঁহুছি। পথে কুমিল্লায় কমরেড রায়সহ কয়েকজন কর্ম্মীকে গাড়িতে উঠতে দেখি। এরা আখাউরা যাচ্ছেন রিলিফ কার্য্য নিয়ে। সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের ইতিবৃত্ত জেনে নেই এখানে। আখাউরা গিয়ে খোলাখুলি আলাপে সব পরিষ্কার হয় ও দুর্ঘটনার স্থান ও বিধ্বস্ত অঞ্চল চাক্ষুষ অবলোকন করি। ৪/৫টি উল্লেখযোগ্য বাড়ীসহ অনেক পোড়া বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। জনৈক কৈবর্ত্ত দাস এর বহু হাজার টাকার শুক্‌নো মাছ ও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সামান্য ব্যাপার নিয়েই বিরাট মনোমালিন্য ও দাঙ্গার সূচনা হয়। মানুষের মন নানা কারণে বিষাক্ত হওয়ায় প্রীতির সম্বন্ধ দূরীভূত হয়ে এই ভীতির সঞ্চার করেছে। কবে যে আমাদের হুঁস হবে! স্বার্থান্ধ লোকের হাত রয়েছে এরমধ্যে এক ডজনের ওপর (উভয়পক্ষের)

হত হয়েছে হতভাগ্যের দল।

পথে গোকর্ণঘাটে আমার পরণে খদ্দর দেখে জনৈক মুসলমানের গাত্রদাহ হয় ও তার আবোল তাবোল কথা শুনে প্রয়োজন বোধে জবাব দিই। বেচারা বেগতিক দেখে আম্‌তা-আম্‌তা করে সরে পড়ে অবশেষে। হায়রে মনোবৃত্তি। Sri Nahaকে কুমিল্লা যেতে দেখি ও সংবাদ দেই্ ও নেই্।

12th July 1947, ২৭শে আষাঢ়, শনিবার—নবীনগর এসে কম. দে-র দেখা পাইনি। এখনও ফিরেনি ফরিদপুর হতে। আজই আসবার কথা আছে। বাস্তবিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির। তার বাজার খরচ তাকে বুঝিয়ে দিই, দেখে খুশী হন। শ্যাম ভোলাচণ্ড চলে যাই সেদিনই। কোন Volunteer পাঠানোর আর কোনো প্রয়োজন নেই Akhaura-তে। Conference হবে না এইসময়। সংবাদটা জরুরী কিন্তু।

13th July 1947, ২৮শে আষাঢ়, রবিবার—সকালে উঠেই Com. Roy-এর সাথে স্থানীয় নানা সমস্যা নিয়ে প্রাণখোলা আলাপ হয়। তিনি সাবধানে ও ধীরে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেন। তাড়াতাড়ি মোকর্দ্দমার জরুরী কাজে তাঁকে কুমিল্লা যেতে হয় বলে আলাপ অসমাপ্তই থেকে যায়। সপ্তাহ মধ্যে আবার ফিরবেন জানিয়ে যান। আমি Party Office-এ যাই ৯টায়, কিন্তু ২/৩ জন ছাড়া বিশেষ কারুর সাথে দেখা হয় না, অনেকেই আমার আসার আগে কাল (শনিবার দুপুরে) Akhaura-তে নৌকায় চলে গেছে Conference-এ যোগদান করতে। বিকেলে ৪টায় আবার আমি Party Office-এ যাই আলোচনা করবো বলে।

বিকেল প্রায় ৫টায় কর্ম্মিগণ আসে। ৬//.টা পর্যন্ত এদের ৭জনকে নিয়ে Class ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। ২/১টি ছাড়া কেহই বিশেষ Serious নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ মনোবৃত্তি। Comrades—বিধু সাহা, হরিপ্রসাদ পাল, নিত্য সাহা, নিরঞ্জন ঘোষ, অমল চৌধুরী, সুখেন্দু (দুলু) চৌধুরী ও ক্ষিতীশ দাস উপস্থিত ছিল; অনিল সরকার কিছুক্ষণ থেকে কেটে পড়ে, ভেগে যায়—বোধহয় সাধারণ আড্ডা নয় এইজন্যেই। বয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। স্থানীয় কয়েকজন সাধারণ চাষী ও আমাদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হয়ে শুনেন সব মন দিয়ে। সরল করেই আরো বলতে চেষ্টা করি উৎসাহভরে।

19th July 1947, ২রা শ্রাবণ শনিবার পর্যন্ত দিনলিপি পাওয়া যায়। এরপর আর এই দিনলিপি পাওয়া যায়নি। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হয়। প্রফুল্লকুমারও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি কলকাতা চলে আসেন। অবশ্য উপরোক্ত কয়েকদিনের দিনলিপি থেকে কয়েকটি

বিষয়ের আভাষ পাওয়া যায়। প্রফুল্লকুমার দলের কাজকর্ম চালানোর জন্য যে খরচ পেতেন তার একটি নমুনা থেকে জানা যায় যে তিনি কতটা সজাগভাবে সেই অর্থ খরচ করতেন। R.S.P.I দলের হয়ে কি কি কাজ করতেন বা প্রচার কার্য চালাতেন। দলের হয়ে নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'ঋষি' সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ চালিয়েছেন। দাঙ্গা তখন থেমে গেছে তথাপি তার রেশ তখনও রয়েছে। মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি তখনও পুরোপুরি থামেনি। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নানারকম সামাজিক দুর্বলতা দূর করার জন্য। কিন্তু সামাজিক সংস্কারের দুরূহ কাজে মাঝে মাঝেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। মানসিক দৃঢ়তা বাড়াবার উদ্দেশ্যে তিনি যে সাধনা করতেন তা তার উক্তি—"ভূত ছাড়ার মন্ত্র জানি—আসন পেড়ে বসে নিবিষ্ট মনে ভাবি গভীরে" ইত্যাদি উক্তি থেকে জানা যায়। আর একটি বিষয় তার দিনলিপি থেকে বোঝা যায়, মনে যখনই নানারকমের টানাপোড়েন হয়েছে তখনই তিনি দিনলিপি লিখেছেন। এইরকম প্রচেষ্টা পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জেলের থেকে উদ্ধার হওয়া খাতায় পাওয়া যায়। আবার দলীয় কর্মীরূপে কাজ করার সময় মনে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে তা তাঁর এই সময়কার দিনলিপি থেকে বোঝা যায়। "কলকাতার বন্ধুর আবেগপূর্ণ আমন্ত্রণ লিপি টানে আমায় ওদিকে। নিবিষ্ট মনে ভাবি গভীরে—অতি গভীরে, দূরে অতি দূরে চলে যাবার ইঙ্গিত পাই বারে বারে।" শহীদ স্মৃতি লিখবার কথা ভেবেছেন। আবার এ ব্যাপারেও নিজের দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ করেছেন "কিন্তু শেষ হবে কী? একেবারে অকর্মণ্য—তোমার সময় সুযোগ আর হবে না কভু" প্রভৃতি উক্তির মাধ্যমে। তাঁর দিনলিপিতে যে সব জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে ঐসব অঞ্চলে প্রফুল্লকুমারের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীন ভারতেও প্রফুল্লকুমারের কর্মজীবনে সমাজসেবামূলক কাজকর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে।

কলকাতায় চলে আসার খবর পাওয়া যায় **স্বরাজ পত্রিকার ২৭শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৫৪ সালের (ইংরাজি সেপ্টেম্বর, ১৩, ১৯৪৭, শনিবার)** একটি সংবাদে।

সংবাদটি ছিল এইরকম—

বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী

সুদীর্ঘ ১০ বৎসর পর শুক্রবার

কলকাতা আগমন

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

গত শুক্রবার সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর বাঙ্গলার বিপ্লবী নেতা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (আর.এস.পি.আই.) কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার

নিমিত্ত হাওড়া স্টেশনে প্রায় দশ সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিল। ট্রেনটি আড়াই ঘণ্টা বিলম্বে সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রবন্দী শ্রীযুত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে মাল্য ভূষিত করেন। পরে বিভিন্ন দলের ও শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ ও জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে মাল্য ভূষিত করা হয়।

[সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার] Saturday, September 13, 1947

সম্মুখীন

দিল্লীর পরিস্থিতির উন্নতি

পাতিয়ালায় সৈন্যদের গুলী বর্ষণে ১০০ জন হত

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য

বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী

সুদীর্ঘ ১০ বৎসর পর শুক্রবার কলিকাতা আগমন

প্রতিশোধস্পৃহা

শ্রমিকদের সমাজ জীবনের উন্নতি

স্বরাজ ২৭শে ভাদ্র শনিবার ১৩৫৪, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৪৭

.....অতএব লক্ষ্য করা যায় যে প্রফুল্লকুমার ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট শুক্রবার স্বাধীনতার পর থেকে কলকাতাতেই অবস্থান করেন।

নবম অধ্যায়

কর্মজীবন

স্বাধীন ভারতে প্রফুল্লকুমারের কার্যাবলী ঃ

স্বাধীন ভারতে এসে তিনি ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গয়া, কাশীধাম ভ্রমণে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিতার মৃত্যুর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করা। ছোটবোন সুহাসের লেখা একটি চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি 'যুগ শিল্প লিমিটেড' নামক একটি বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা ছিল ৩২নং কলিমুদ্দিন সরকার লেন, বেলেঘাটা। প্রফুল্লকুমার ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টরদের অন্যতম। এখানে হস্তচালিত তাঁতে খদ্দর ও যাবতীয় বয়ন কার্য বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত করা হত। এই ব্যাপারে যুগশিল্পের প্যাডে শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্যের লেখা দুখানি চিঠি বিদ্যমান। এবং চিঠিগুলির প্রাপক হিসেবে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লেখা রয়েছে। ফলে তিনি যে তখন যাদবপুরে কর্মরত ছিলেন তা বোঝা যায়।

অপরদিকে বেলেঘাটায় "দারুশিল্প প্রতিষ্ঠান" নামের একটি কাঠের আসবাবপত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল সেন। সম্পাদক অপর একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু বিভিন্ন চিঠি পত্র থেকে জানা যায় (৪.৮.৪৯ তারিখ, ৩.৫.৫০ তারিখে শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের চিঠি দুখানি প্রাপক হিসেবে শ্রী প্রফুল্লকুমার সেন, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নাম পাওয়া যায়)। অভিজ্ঞতার এবং অর্থাভাবের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। প্রফুল্লকুমারের যাদবপুরের বাড়ীতে "দারুশিল্পে" প্রস্তুত সেগুন কাঠে তৈরি কতিপয় আসবাবপত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন আজও বহন করছে।

গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রফুল্লকুমারের চরকা ছিল। তিনি নিজে চরকায় কেটে খদ্দরের একটি কাপড় বুনেছিলেন। কাপড়খানি মোটা ছিল। কিন্তু নিজে হাতে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত প্রফুল্লকুমার

তৈরি কাপড়খানি তিনি দীর্ঘদিন পরেছিলেন।

যাদবপুরে College of Engineering Technology, Bengal পরে যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৪.১২.১৯৫৫) রূপান্তরিত হয়, সেখানে গ্রন্থাগারে ১৯৪৮ সালে যোগদান করেন। কর্মজীবনে প্রবেশের পরও তাঁর সামাজিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম চলতে থাকে। প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায় M2/126/50 তারিখ ২০.৩.১৯৫০ তারিখে প্রিন্সিপ্যাল টি. সেন (ত্রিগুণা সেন) এর সই করা একটি চিঠি যাতে বনগাঁয় রিলিফ কাজে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে member of staff incharge of group হিসেবে প্রফুল্লকুমারের নাম পাওয়া যায় ও বনগাঁয় সেবা কার্যে রত অবস্থায় একটি ছবিও। (পরিশিষ্ট চার ঃ চিত্রাবলী দ্রষ্টব্য)

ঐ বছরেই পূর্ববাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের কাজে প্রফুল্লকুমার আত্মনিয়োগ করেন। যাদবপুরের পূর্বদিকে এক অঞ্চলের জমিদার ছিলেন পালেরা। পালের বাজার নামটি এখনও তার প্রমাণ হিসেবে রয়েছে। এই পালেদের জমি দখল করে পত্তন করা হয় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ। প্রফুল্লকুমার ছিলেন এই কলোনির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন অপর স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার ভৌমিক,

যতীন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ কিছু বন্ধুকে। কলোনির নামকরণ করলেন "বিবেকনগর কলোনি"। উদ্দেশ্য নামকরণ থেকে যাতে বোঝা যায় "আমরা বিবেকবান উদ্বাস্তু"। পাশাপাশি আরও কয়েকটি কলোনি আদর্শনগর, শহীদনগর নাম নিয়ে গড়ে ওঠে।

কলোনির অধিবাসী শিশুদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছিল দুইটি বিদ্যালয়। এই জায়গার জমিদার পালেরা শ্রী গঙ্গাদাস পাল ও তাঁর ভাইরা পাঁচ বিঘে জমি প্রফুল্লকুমারকে দেন। সেই জমিতে গড়ে ওঠে শ্রীগঙ্গাদাস বাবুর পিতার নামে উৎসর্গীকৃত বিদ্যালয় "নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন।" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি—প্রফুল্লকুমার সেন, সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় "আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন" এই বিদ্যালয়টিরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন—প্রফুল্লকুমার সেন, সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত। কলোনিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য স্থাপিত হয় বিবেক সংঘ (১৯৫০) এবং Nabakrishna Pal free reading hall. বিবেক সংঘেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি—প্রফুল্লকুমার সেন ও সম্পাদক—ডঃ বিমল চন্দ।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বিনোদিনী নৈশ বিদ্যালয়—ঢাকুরিয়ার, সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত শিক্ষাবিদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুত হরিপদ সেনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বর্ধমান (কলানবগ্রাম) শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী সাধনা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হালতু আর্য বিদ্যালয়েরও কার্যনির্বাহী সমিতির তিনি ছিলেন আমৃত্যু সদস্য। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, যেমন অনুশীলন সমিতির কার্যালয় অনুশীলন ভবন, নিখিল বঙ্গ শহীদ ও দেশসেবক স্মৃতি সমিতি, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি, সম্বলকাঠী সম্মিলনী, বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি, যতীন্দ্রমোহন রায় স্মৃতি রক্ষা সমিতি, অগ্নিযুগ বিপ্লবীসংসদ, বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ স্মৃতি সমিতি (নিরালম্ব স্বামী বর্দ্ধমান), Benoy Sarkar Institute of Social Sciences. বিভিন্ন পত্র পত্রিকার আমৃত্যু গ্রাহক ছিলেন, তার মধ্যে 'অনুশীলন বার্তা' ও 'বিপ্লবী বাংলা' 'যুগবানী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রফুল্লকুমার ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ জানতেন ও নানারকম রোগের ওষুধ দিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন ওষুধ রাখার জন্য একশত ওষুধের একাধিক বাক্স তাঁর ছিল। তিনি চোখের ছানি কাটাবার জন্য একপ্রকার কবিরাজী ওষুধও জানতেন। এই চিকিৎসা ছিল পারিবারিক। পিতা নবীনচন্দ্রের কাছ থেকে এই ওষুধের প্রয়োগ শিখেছিলেন। এইসব ওষুধ বিনা পয়সায়

লোকজনকে দিতেন। একটি চিঠি এ বিষয়ে খানিকটা তথ্য দেবে। চিঠিটি জনৈক পি.এন.বাজপেয়ী শ্রীপ্রফুল্লকুমারকে লেখেন তারিখ পাওয়া যায় ৪ আগস্ট ১৯৫২।

চিঠিটি এইরূপ—

Dear Sir,

I have been just now informed by my friend—Sri J.M.Dutt—that you happen to know some medicine for cataract in its primary stage. I have got cataract in my left eye which is in the primary stage. I shall be much obliged if you would kindly communicate with me and let me know about the medicine. A self addressed post card is annexed here to.

Sri P.N.Vajpeyi
C/o Secretary
Calcutta Stock Exchange Association Ltd.
7, Lyous Range
Calcutta 1

Yours faithfully
Sd/-P.N.Vajpeyi

Sri P.C. Sen
Librarian
Jadavpur College
Jadavpur

চিঠিটিতে ৪ঠা আগস্ট ১৯৫২ স্ট্যাম্প আছে।

Replied on 3.9.52 by P.K.Sen

Dear Sir,

Thank you for your letter D 4.8.52. I regret very much that due to heavy pressure of work. I could not send you a reply earlier. Hope, I will be execused. As regards the treatment of your cataract, it is necessary to examine your eye personally, so it would be better, if you could manage to come over to the dispensary at the following address, between 7-8p.m. except on Sundays.

Address
P.K.Sen
C/o-Dr. N. Basu M.B
1B Sashi Bhusan Dey St.
Calcutta-12

Yours truly
Sd/- P.K.Sen 3.9.52
Jadavpur College
Cal-32

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ১৯৫৬ সালের ২রা মে থেকে দুই মাসের প্রিভিলেজ লিভ নিয়ে প্রফুল্লকুমার কেদারবদ্রী ভ্রমণে যান। চিঠিটি To the

Registrar, Jadavpur University, Cal-32. Dt. 16.4.56 তারিখে লেখা। চিঠিটি তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রী এন.সি.মৈত্র recommend এবং forward করেছেন ১৬.৪.৫৬ এবং তৎকালীন registrar P.C.V. Mallick P/L grant করেছেন ১৬.৪.৫৬ তারিখে।

অতএব কেদারবদ্রী যাত্রা। তখন কেদারের পথ ছিল দুর্গম। রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদার ও তারপর আবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথ যেতে হত পদব্রজে। এই দুর্গম পথে প্রফুল্লকুমারের সঙ্গী ছিলেন অপর বিপ্লবী শ্রীগণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অপর দুইজন। প্রফুল্লকুমারের কেদারে তোলা ছবি এবং কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। দুর্গম ও মনোরম দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ কেদার ও বদ্রীযাত্রা নিয়ে একটি রম্যরচনা তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যুভেনিরে লিখেছিলেন। কিন্তু লেখাটি উদ্ধার করা যায়নি।

দশম অধ্যায়

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

১৯৫৭ সালে প্রফুল্লকুমার বিবাহ করেন। পত্নীর নাম ফুলপিয়ারা (মীনা)। পাত্রীর পিতা অনন্তকুমার বসু ছিলেন প্রফুল্লকুমারের নোয়াখালী দত্তপাড়া স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক। এ ব্যাপারে একটি মজার গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। স্কুলে পড়ার সময়ও প্রফুল্লকুমার অনুশীলন সমিতির কাজে সময় ব্যয় করতেন। এর ফলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনয়নের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ফেল করেও অনুদ্বিগ্ন মনে প্রফুল্লকুমার আনন্দে হাতে তালি দিয়ে স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কারণ তাঁকে আর বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে হবে না। এই দৃশ্য নজরে আসে দত্তপাড়া স্কুলের তখনকার তরুণ ইংরেজির শিক্ষক অনন্তকুমার বসু মহাশয়ের। তিনি সুদর্শন ছাত্রটিকে ডেকে নিয়ে উদ্যোগী হয়ে পড়িয়ে পরীক্ষায় বসানোর ব্যবস্থা করেন। এই পরীক্ষার রেজাল্টের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এই ঘটনাটিও বর্তমানে প্রয়াত অনন্তকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র অজিতকুমার বসুর মুখ থেকে শোনা। ফলে সেই থেকে অনন্তকুমার বসু মহাশয়ের সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের যোগাযোগ ছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এবং দেশভাগের পর প্রফুল্লকুমার এপারে চলে আসেন। অনন্তকুমার বসুও তখন হাওড়ার মাকড়দহ বামাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রিয় ছাত্রটির খোঁজ পেয়ে নিজের বড় মেয়ে ফুলপিয়ারার সাথে ১৯৫৭ সালের আষাঢ় মাসে প্রফুল্লকুমারের বিবাহ দেন। ফুলপিয়ারা দেবী (মীনা দেবী) তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পাঠরতা। প্রফুল্লকুমারের বয়স ৫১ এবং পত্নীর বয়স ২৯ বৎসর। উভয়ে সংসার গড়ে তোলেন ১/৭৩ বিবেকনগরের একখানি টিনের চাল দেওয়া বেড়ার ঘরে। অত্যন্ত আদর্শবান প্রফুল্লকুমার পত্নীকে দেওয়া কয়েকখানি অলংকার ও বস্ত্র ছাড়া শ্বশুর শ্রী অনন্তবাবুর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। বিবাহের সময় পরণের ধুতিটিও ছিল নিজের পয়সায় কেনা। শ্বশুরালয় থেকে কোন কিছুই আনেননি। অথচ নিজের সম্বল একখানি এনামেলের থালা ও গ্লাস। তার উপর ছোটবোন সুহাসিনীকেও ত্রিপুরার বিলোনিয়া থেকে তখন যাদবপুরে নিয়ে এসেছেন। আর্থিক সম্বল ছিল

বিবাহের পরে পত্নী ফুলপিয়ারা দেবীর সাথে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের চাকুরি। সেই সময়কার সংসারের খরচের হিসেবের একটি খাতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় তিনি স্বল্প আয়ে কিভাবে সংসার চালাতেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তথাপি সদাপরোপকারী এই বিপ্লবী মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেননি। দৈন্যতা

তাঁর চরিত্রে ছিল না। বিভিন্ন চিঠিপত্র তার প্রমাণ দেবে।

প্রফুল্লকুমারের প্রথম কন্যা সন্তান বাঁচেনি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকদিন পরেই মারা যায়। তারপর দুই মেয়ের পর একমাত্র পুত্র জন্মায়। এই পুত্রটিও অকালে মারা যায়। তারপর ছোট মেয়ে পারমিতার জন্ম। পুত্রের অকালমৃত্যুর পর বলতেন "আমি পিতার একমাত্র পুত্র হয়ে মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতে পারিনি। তাই বাবা আমার পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে পুত্র শোক কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।" এই ভাবনা তাঁকে মানসিক দৃঢ়তা দিত। বর্তমানে তাঁর তিন মেয়ে পূরবী, পুষ্পিতা ও পারমিতা জীবিত।

পত্নী ও কন্যাদের সাথে সপরিবারে প্রফুল্লকুমার

বিভিন্ন সংস্থার তিনি আমৃত্যু সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে আলিপুর কোর্টের জুরি মনোনীত হন। অনুশীলন সমিতির বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে ভূষিত করেন। বিভিন্ন সংস্থা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায় এবং সম্মানপত্র দিয়ে ভূষিত করেছেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

পত্নী ফুলপিয়ারা দেবী আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তনের প্রাথমিক বিভাগের প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন। নিজের এবং পত্নীর সামান্য আয়ে তিন কন্যার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। নিজের টিনের ছোট বাড়ীটি পাকা করেন।
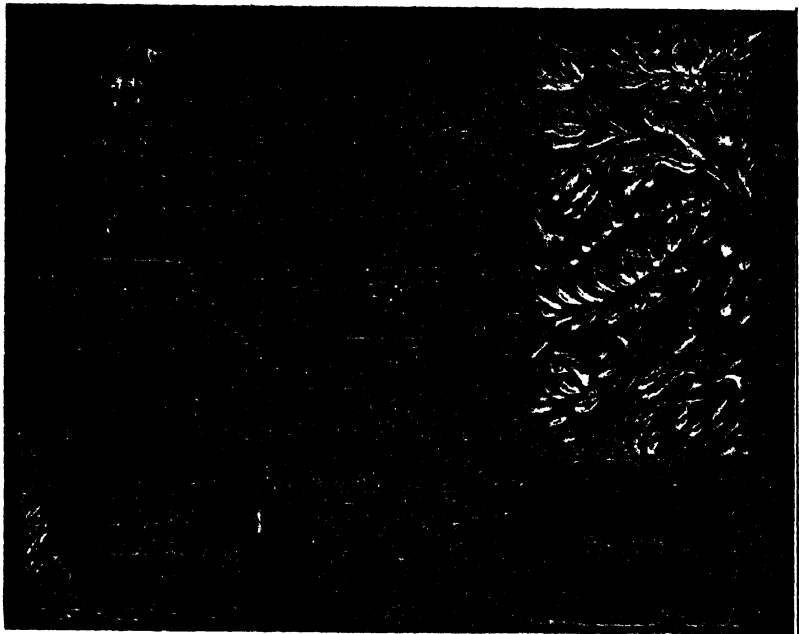
তাম্রপত্র ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত

তখন তিনটি মেয়েই খুব ছোট। বড় মেয়ে পূরবী পড়ে নবম শ্রেণিতে। পত্নীর সামান্য আয়ে সংসার চালানো ছিল খুবই কষ্টকর। বিপ্লবী বন্ধুদের জেদাজেদিতে ভারত সরকারের প্রদেয় সম্মান ভাতা অবশেষে তিনি নিতে বাধ্য হন। কিন্তু অন্য কোনভাবে দৈন্যতা প্রকাশ তাঁর চরিত্র বিরোধী ছিল। তিনি বলতেন "ভারত সরকার যদি বিপ্লবীদের সম্মান ভাতা না দিয়ে দেশের সমস্ত লোকের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করত তা অনেক বেশি আনন্দের হতো।"

এ ব্যাপারে একটি চিঠি প্রফুল্লকুমারের মানসিকতার পরিচয় বহন করে। চিঠিখানি অনুশীলন সমিতির জনৈক বিপ্লবীর

প্রীতিভাজনেষু,

প্রফুল্ল Andaman Scale-এ Pension দেবার জন্য আমরা কয়েকজন দরখাস্ত করিতেছি। তোমার নাম আছে। পরামর্শ করিয়া কাজ করবার সময় ছিল না বলে আমি....করিয়া পাঠাইতেছি। যদি তুমি সই দাও তবে খুশী হব।

একবার দেখা করিলে খুশী হব। এখন আমি... আছি।

আশাকরি ভাল আছ।

ইতি

শুভার্থী

আবেদনে যে অসম্পূর্ণতা আছে...তাহা তোমার নিকট জেনে পরে...বলে মনে করছি। চিঠিটির যে উত্তর প্রফুল্লকুমার লিখেছিলেন তা দেওয়া হল।

শ্রদ্ধাভাজন...

ভিক্ষা বা অনুগ্রহে আমি নেই। তাই আমার নাম দেওয়া অন্যায় হবে। আমি কর্তব্য জ্ঞানে কাজ করি কৃপাভিলাষী নই—কভু।

সে কথাটা বারবার বলতে হচ্ছে কেন? আমার নামটা বাদ দিয়ে দেবেন অবশ্যই। সবার নামই বাদ দেওয়া উচিত। কোন বন্ধুই ভিক্ষায় বিশ্বাসী নন—এই আমার বিশ্বাস। মরবার আগে অপকীর্তি রাখা অনুচিত। অন-অনুশীলনী (রীতি নয়) হবেন না কেউ দয়া করে। সকলের শুভাকাঙ্খী।

আন্দোলনের সময় সুদুর কুমিল্লা থেকে জ্যাঠতুতো ভাইপো তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের সাথে দুই ছেলে বিপ্লব ও বিদ্যুৎবহ্নিকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। এই সময় নোয়াখালী দত্তপাড়া চৌধুরীবাড়ীর রাজা ভুবননারায়ণ চৌধুরীও তখন উদ্বাস্তু অবস্থায় সপত্নী প্রফুল্লকুমারের বাড়ীতে। এত লোক একসঙ্গে মাত্র দুখানা ঘরে থাকতেন। প্রফুল্লকুমার তখন খুবই আনন্দিত। আবার দেশের সম্পর্কিত নিকটজনদের কাছে পেয়েছেন। স্থান সঙ্কুলান, আর্থিক অনটন তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘদিন সবাই মিলে একসাথে থাকা সম্ভব হয় না। ভাইপোর ছেলেরা এবং তার শ্বশুর বাড়ী ভাড়া করে সুভাষগ্রাম চলে যান স্থানাভাবে। প্রফুল্লকুমার চাল গম রেশন থেকে কিনে বয়ে নিয়ে যেতেন সুভাষগ্রাম। তখন যুদ্ধের সময় খোলাবাজারে চাল গম কেনা সম্ভবপর ছিল না। যতদিন তারা এদেশে ছিলেন তিনি যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করেছেন।

পত্নী ফুলপিয়ারা দেবী চিররুগ্না ছিলেন। ১৯৬৫ সালেই ডায়বিটিসে আক্রান্ত হন। ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে ও অন্যান্য পারিবারিক কারণে তখন জর্জরিত এই বিপ্লবী। তথাপি পরোপকারী মন সদাই কিছু করার জন্য উন্মুখ থাকত। যে সব ছাত্র শিক্ষক রাখতে পারত না তাদের পড়া দেখিয়ে দিতেন। পরীক্ষার টাকা জমা দিতে

না পারলে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর বিবেকনগরের বাড়ীটি ছিল সদাই জনসমাগমে পরিপূর্ণ। শুধুমাত্র মেদিনীপুরের ক্যাপাসএড়্যা গ্রামের শ্রীতুহিনকুমার দাসই নয় আরও অনেক ছাত্র এবং আত্মীয়স্বজন পড়াশুনার কারণে ও অন্যান্য প্রয়োজনে এই বাড়ীতে থেকেছেন। পূর্ববঙ্গের ঘাসিগ্রামের জমি জায়গা নিজের জ্যাঠতুতো দাদার ছেলেকে দানপত্র করে লিখে দিয়েছিলেন। অন্যান্য জ্যাঠতুতো দাদার ছেলেদেরও নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের একটি নমুনা দেওয়া হল। চিঠিটি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমুকুর সর্বাধিকারী প্রফুল্লকুমার সেনকে লিখেছিলেন।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

কথা ছিল আপনার বাড়ী যাবার। কিন্তু কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার জন্য, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ইতিমধ্যে ৪ মাস কেটে গেছে।

একমাস পরে রডা অস্ত্র অপহরণের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে National Archives ও জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রায়ই যেতে হচ্ছে। এর জন্য পয়সা জোগাড় করতে হচ্ছে।

লাহিড়ীর শরীর খারাপ ছিল। ওর অসুস্থতাও অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল।

আপনার রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। তবু স্বাধীনতা সৈনিক হিসাবে আপনার নিষ্ঠা ও যুক্তিগ্রাহ্য মন সব ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারে বলেই জানি।

আপনার পরিবারের সকলের কাছে এর জন্য আমি প্রার্থী।

প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহ

মুকুর সর্বাধিকারী

সতীর্থ বন্ধু এবং স্বদেশী স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় দাদারা যতদিন জীবিত ছিলেন এই বাড়ীতে এসেছেন, থেকেছেন। তিনি তাঁদের বলতেন "আমার পর্ণকুটিরে আপনাদের standing নেমন্তন্ন রইল। আমি কাউকে কিছু করার কে? যে যার নিজের ভাগ্যে নিজের আহার জোটায়?" "অতিথি হল নারায়ণ"। যে দিন কেন অতিথি থাকত না তাঁর মন খারাপ থাকত। গ্রামে বাড়ীর অনেক লোকজনের কথা সবসময় স্মরণ করতেন। ছোট বোন সুহাসকে তো সপরিবারে বিবেকনগরেই নিয়ে এসেছিলেন। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তাঁর শেষদিন পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল তারা হলেন মহারাজ শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, শ্রী অতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীশচীন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতা (পতুদা), শ্রী যতীন রায় (ফেগুদা), শ্রীরমেশ চন্দ্র আচার্য (রমেশদা), আশুদা, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ (বাংলায় বিপ্লববাদ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক) শ্রী কালীদা (কালীপ্রসন্ন মজুমদার), শ্রীহারান ঘোষচৌধুরী, শ্রীসীতানাথ দে প্রমুখ উল্লেখ্য। শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী,

শ্রী অনুকূল চক্রবর্তী, (শ্রী রাসবিহারী বসুর সহযোদ্ধা), শ্রী রাধাবল্লভ গোপ, (আর.এস.পি.আই দলের নেতৃস্থানীয়) প্রমুখ ছিলেন শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী, শ্রী জগদীশ চ্যাটার্জী, শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক, শ্রী জীবনতারা হালদার, শ্রীমুকুন্দ চক্রবর্তী, শ্রী নির্মল গুহঠাকুরতা, শ্রী সাধনানন্দ গুহঠাকুরতা, শ্রী কুলেশ সরকার, শ্রী শান্তি মিত্র, শ্রী সত্যরঞ্জন ঘটক, শ্রী তারাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রী তারাপদ মিত্র, শ্রী জলধর পাল, শ্রী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত (আগরতলা), শ্রী মনমোহন চক্রবর্তী (বারাণসী), শ্রী প্রবোধ ঘোষ, শ্রীরমেন পালচৌধুরী, শ্রী শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী, স্কুলের বন্ধু শ্রী যোগেশ চক্রবর্তী, (আর.এস.পি.আই দলের নেতা, পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিপুরার মন্ত্রী, কলকাতা আসলে দেখা করতেন)। শ্রীপ্রফুল্ল নন্দী, শ্রী রাখাল কর। শ্রীনগেন পাল (বিজয়গড় কলোনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।) এরা প্রায়শঃ তাঁর যাদবপুরের বাড়ীতে আসতেন, রবিবারে চলত তাঁদের রবিবাসরীয় আড্ডা। কলকাতা দূরদর্শন 'বিকেলের বৈঠক'

হন এবং বিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তরিত করার ভাবনা ও প্রয়াস তাঁর ছিল। তবে যে কোন কারণেই হোক তার এই প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করেনি। তবে নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন আজ এলাকার একটি নির্ভরযোগ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে এবং সুনাম রক্ষা করছে।

তাঁর স্থাপিত আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন (তাঁর আবাসস্থলের বিপরীত দিকে যার অবস্থান) এলাকার মেয়েদের জন্য একটি সুপরিচিত উচ্চমাধ্যমিক স্কুল।

শেষ জীবনের একটি বিশেষ স্মরণযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বড়বাজারের শ্রীলালতা প্রসাদ সীতারামের সঙ্গে প্রফুল্লকুমারের ছিল গভীর দোস্তি বা বন্ধুত্ব। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি প্রতিবছর দেওয়ালির দিন প্রফুল্লকুমারের বিবেকনগরের বাড়ীতে আসতেন। তখন চলছে প্রফুল্লকুমারের কঠোর জীবনসংগ্রাম। তিনি বিবেকনগরের বাড়ীটি দোতলা করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেন যাতে পরবর্তীকালে প্রফুল্লকুমার বাড়ীর নীচের তলাটি ভাড়া দিয়ে অর্থের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। কিন্তু প্রফুল্লকুমার যে কোন দান গ্রহণে অরাজী ছিলেন। সীতারামজীর বাড়ী ছিল লক্ষ্ণৌ-এর সীতাপুরে। প্রফুল্লকুমারের কিছু টাকা তাঁর কাছে জমা রাখা ছিল। কিন্তু একথা তার স্ত্রী বা পরিবারের কেউ জানতেন না। সীতারামজী দেশে গিয়ে আকস্মিক অসুস্থতায় পরলোকগমন করেন। এই সংবাদে প্রফুল্লকুমার খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। সীতারামজী তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

এই অকৃত্রিম বন্ধুর একখানি ছবি অয়েল পেন্টিং করানো আছে। সীতারামজীর ভাইপো জিতেন্দ্রপ্রসাদ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী মহাবীর প্রসাদ কলকাতার ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। ১৯৯০ সালে তখন আর প্রফুল্লকুমার একা দূরে চলাফেরা করতে পারেন না। বেশ কয়েক বছর আর বড়বাজারে যেতে পারেননি। একদিন জিতেন্দ্রপ্রসাদ ও মহাবীর প্রসাদ প্রফুল্লকুমারের বাড়ীতে আসেন। তাঁদের উভয়েরই বয়স হয়েছে। প্রফুল্লকুমারকে দেখে বলেন "মাস্টারজী আপনার দীর্ঘদিন খবর না পেয়ে আমরা ভেবেছি আপনি জীবিত নেই। আমাদেরও বয়স হয়েছে। এবার ছেলেদের হাতে ব্যবসার ভার দিয়ে দেশে ফিরে যাব। তাঁরা প্রফুল্লকুমারের বড়বাজারে রেখে আসা একটি ট্রাঙ্ক ও সীতারামজীর ব্যবসার একটি অংশের (যা তিনি তাঁর বন্ধু প্রফুল্লকুমারকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রফুল্লকুমার যা থেকে কোনদিন একটি টাকাও নেননি)। হিসেবের টাকা ৪৭,০০০ টাকার একখানি চেক এবং হিসেব সম্বলিত একটি কাগজ প্রফুল্লকুমারের পত্নীর হাতে দেন। প্রফুল্লকুমারের ছোট কন্যা পারমিতার বিবাহে ঐ অর্থ খুবই কাজে লেগেছিল। এই ঘটনাটির উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এর মাধ্যমে শুধু প্রফুল্লকুমারের ব্যক্তি চরিত্রের পরিচয়ই নয় ঐ বন্ধুর পরিবারের ব্যক্তিদের সততা ও প্রফুল্লকুমারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রমাণ রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকায়

(ক) **বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ**

১। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ দেওয়া আছে। পৃঃ ২৬৩ তে।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

২। অত্যাচারের কবলে বিপ্লবী অধ্যায়ে একরার করাইবার পদ্ধতি অনুচ্ছেদে পৃঃ ২৯০তে যে বিবরণ দেওয়া আছে।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৩। বিভিন্ন দলে সহযোগিতাও ছিল পৃঃ ৩০২ অধ্যায়ে যে বিবরণ দেওয়া আছে।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৪। পরিশিষ্ট অধ্যায়ে বন্দীজীবনে সংগ্রাম নিষ্ঠা অনুচ্ছেদে পৃঃ ৩৬১তে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(খ) জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ) ২য় সংস্করণ পরবর্তী পর্যায়ে বইটি **জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম** ৪র্থ সংস্করণ নামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন মামলা অধ্যায়ে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ ১৯৩৪ সন, পৃঃ ২৮৭।

"আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলিতেছিল তখন অনুশীলন সমিতির তরুণ পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্থানে দল গঠন করিতেছিল। বিভিন্ন জেল হইতে যাহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহারাও টিটগড়ে একত্র হইলেন। পুলিশ টিটাগড়ে বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পারুল মুখার্জি, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্যামবিনোদকে গ্রেপ্তার করেন। ...আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও টিটাগড় একই ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই মামলায়...প্রফুল্ল সেন ১৪ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন।

....

ইহারা সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য অধ্যায়ে যে বিবরণ পাওয়া যায় পৃঃ ৩২৮-

৩৩৭।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দলের কয়েক সহস্র নির্ভীক যুবক নানাভাবে অত্যাচার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, সুদীর্ঘকাল কারাবাসে কাটাইয়াছেন। সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই, যাহাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

অনুশীলন সমিতি, জিলা-কুমিল্লা

প্রফুল্লকুমার সেন, ঘাসিগ্রাম জেল ১৫ বৎসর, (৪২, ৩৮, ৫১, ৪৫) দিন অনশন, ৪৮ মাস পলাতক।

(গ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ইতিহাস—তারাপদ লাহিড়ী—এই গ্রন্থে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা—১৯৩৫ পৃঃ ১৭০, পৃঃ ১৭৩, পৃঃ ১৭৪-১৭৫, পৃঃ ১৮২-১৮৩তে বিবৃত হয়েছে।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা—১৯৩৫

কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট শিল্পনগরী টিটাগড়। এখানকার নানা কলকারখানার মধ্যে টিটাগড় পেপার মিলস সমধিক পরিচিত। ঘটনাচক্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সাথে এই ক্ষুদ্র সহরের নাম যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পৃঃ ১৭৪-১৭৬।

এরপরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রফুল্ল সেনের গ্রেপ্তার। ঐ সময়ে প্রফুল্ল সেন (নিবাস কুমিল্লা) আত্মগোপন করে বেলঘরিয়ায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর কর্মচারীদের একটি মেসে অবস্থান করছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তার খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৯৩৫-এর ১৬ই জানুয়ারি পূর্বোক্ত মেস থেকে বেরিয়ে তিনি টিটাগড় সহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রফুল্লবাবু বেঁটে মানুষ হলেও ঐ সময়ে তাঁর চেহারা ছিল পালোয়ানী ধরনের। তার উপর কয়েকদিন স্নান না করায় তাঁর মাথার চুল ছিল অবিন্যস্ত। স্থানীয় গ্রামরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন সুরেন ঘোষ হুইসেল বাজিয়ে লোক জড়ো করে প্রফুল্লবাবুকে ঘিরে ফেলেন। প্রফুল্লবাবু প্রচণ্ডভাবে লড়াই করেন। কিন্তু শুধু হাতে বহুলোকের সাথে লড়াই করে জয় অর্জন সম্ভব নয়। অতএব গ্রামরক্ষীর বাহিনী তাঁকে ধরে টিটাগড় থানায় সমর্পন করে। থানার পুলিশ প্রফুল্লবাবুর বৈপ্লবিক পরিচয় অবগত ছিলেন না। কিন্তু ঐ সময়ে সমস্ত থানার উপরে সরকারী নির্দেশ ছিল যে অপরিচিত সন্দেহজনক ব্যক্তি ধরা পড়লেই গোয়েন্দা বিভাগের গোচরে আনতে হবে। থানা থেকে খবর পেয়ে লর্ড সিংহ রোড থেকে আই. বি. পুলিশ আসে। প্রফুল্লবাবু পলাতক থাকায় তাঁর ফটোগ্রাফ পুলিশ

গেজেটে ছাপা হয়েছিল। সেই ফটোগ্রাফের সাথে মিলিয়ে আই. বি পুলিশ প্রফুল্লবাবুকে পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বলে সনাক্ত করে।

পৃঃ ১৭৮—মোকদ্দমার উদ্বোধন কালে সরকারী উকিল বলেন যে, আসামীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করতেন। প্রফুল্ল সেনের দলীয় নাম ছিল—'রাঙ্গ দা'।

পৃঃ ১৮২-১৮৩—এই ষড়যন্ত্রে পূর্ণানন্দের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রফুল্ল সেনের। উক্তরূপে মন্তব্য করে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিগণ...প্রফুল্লবাবুকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

(ঘ) **Terrorism in India 1917-1936** compiled in the Intelligence Bureau, Home Department, Government of India p. 63 [1937]

The Titagarh Conspiracy Case.

During the year 1935, a very decisive blow was struck at the Anushilan party in Bengal and Faridpur by the investigation and subsequent trial of what is known as the Titagarh conspiracy case, which at the time of writing, has only just been concluded....A protracted and careful investigation followed, incourse of which no less than 171 persons were arrested. Of these, 33 were sent for trial before the special tribunal which began hearing the case in November 1935. Purnananda Dasgupta has been sentenced to transportation for life, **Prafulla Sen to twelve years rigorous imprisonment** and fifteen others to various terms of imprisonment.

(ঙ) অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস, প্রণীত পুস্তকটির পৃঃ ৮২-তে পাওয়া যায়।

টিটাগড়ের গুপ্ত ঘাঁটিতে হানা দেবার সময়...ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নতুন করে আর এক মামলা দায়ের করে। এই মামলার নাম "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা।" আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র আর টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার দুটি পৃথক অধ্যায়। এই মামলায়...প্রফুল্লকুমার সেন প্রভৃতি ২৯জন বিপ্লবীর বিচার হয় এবং মামলায় তাঁদের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

(চ) **অবিস্মরণীয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড** পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯ তে পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সনের ২৯ শে জানুয়ারি টিটাগড় থানার গোয়ালপাড়া থেকে কয়েকজন ধরা পড়লেন...একে একে ধরা পড়লেন ত্রিশজন...। আরম্ভ হল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা...৫০২ জন সাক্ষী ফরিয়াদী তরফে সাক্ষী দিলেন। ১৯৩৭ সনের ২৭ এপ্রিল ট্রাইবুনাল রায় দিলেন। ১৭ জনের দণ্ড হয়ে গেল। প্রফুল্ল সেন...আপীল

করেন।

(ছ) দেশের যারা সেরা লোক তাদের কয়েকজন ঃ

আর. এস. পি. আই, বুলেটিন নং ৫।

প্রফুল্ল সেন—শারীরিক দক্ষতায় দুর্জয় বলিয়া বাল্যকালেই তিনি ডানপিটে নাম কিনেন, ভবিষ্যৎ জীবনের মোড় কোন দিকে নিবে—শৈশবের একটি ঘটনা হইতেই তাহার আভাস মিলে। গ্রামে একটি যোগীর মৃত্যু হইল। গ্রামের কেহই তাহাকে স্পর্শ করিবে না। তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা। আত্মীয়স্বজন, গ্রামের সকল লোকের অনুনয় বিনয়, শাসানী সব কিছু উপেক্ষা করিয়া প্রফুল্ল একাই তাহাকে বহন করিয়া নিয়া তাহার সৎকার করিয়া আসিলেন। স্কুলে পড়বার সময়েই তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর দলীয় কাজর জন্য তাহাকে বিভিন্ন স্কুলে পড়িতে হয়। তাঁহার স্বভাব এমনই ছিল যে, খুব তাড়াতাড়ি তিনি ছাত্রদের প্রিয় হইয়া উঠিতেন এবং এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়াইতেন। ছাত্রাবস্থার পর তিনি ঈশ্বর পাঠশালার ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে বাড়ীঘর চাকুরী সকল কিছু ছাড়িয়া তিনি কংগ্রেসের গণসংযোগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই দলীয় কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। তিনি উহা এড়াইবার জন্য আত্মগোপন করিলেন। সমিতির কাজে এই সময় বাংলার জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করেন। এমনি সময় ২৪ পরগণায় তিনি ধরা পড়িয়া যান। পুলিশ প্রথমে সনাক্ত করিতে পারে নাই। পরে সনাক্ত করিয়া বুঝে ইনিই সেই পলাতক প্রফুল্ল সেন। আত্মগোপন করিবার সময় তাহার নামে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। ধরা পড়িবার পর বিচারে তাঁহার তিন বৎসর জেল হয়। পরে টিটাগড় ষড়যন্ত্রে নেতৃস্থানীয় বলিয়া তাঁহাকে ১২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যখন আদালতে বিচার চলিতেছিল তখন বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন তাঁহারা terrorism-এর পথ নেন নাই। সরকারই সেই পথ গ্রহণ করিয়াছেন।

(জ) আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল Thursday, February 27, 1947

গান্ধীজী বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধী

রাজনৈতিক কর্মীদের সহিত আলোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৬শে ফেব্রুয়ারি

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(ঝ) স্বরাজ পত্রিকা ২৭ শে ভাদ্র শনিবার ১৩৫৪ সাল ইংরাজী September 13, 1947 Saturday.

সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীরমেশ চন্দ্র বোস কর্তৃক ১০ ক্রিক রোড স্বরাজ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল্য-এক আনা।

বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী

সুদীর্ঘ ১০ বৎসর পর শুক্রবার

কলকাতা আগমন

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(ঞ) বিপ্লবী বাংলা ২১শে আগস্ট ১৯৯৩ শনিবার ৪ঠা ভাদ্র ১৪০০ দ্বাবিংশ বর্ষ ৪১-৪২ সংখ্যায়।

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(ট) অনুশীলন বার্তা বর্ষ ১৬ ২য় সংখ্যা ২৩শে আগস্ট ১৯৯৩

"পরলোকে বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেন"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন, ১৯০৬ সালের ৪ঠা মার্চ (ইং) অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ঘাসীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয় এবং ১৯৩১ সালে দলের নেতৃত্বের নির্দেশে অনুশীলনের সংগঠনের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বরিশাল যান এবং বরিশালকে কেন্দ্র করে বরিশাল, খুলনা এবং ফরিদপুরে অনুশীলনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৯৩৪ সালে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম দলনেতা হিসেবে ধরা পড়েন। এর পূর্বে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত হিসাবে পুলিশ তাঁর জন্য অনুসন্ধান চালায় কিন্তু তখন তিনি ধরা পড়েননি। তিন বছর বিচারাধীন থাকার পর তিনি ১৮ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে থাকার সময় তিনি সমস্তরকম অত্যাচার, লাঞ্ছনা এবং নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পান এবং নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে গান্ধীজীর সাথে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবার কাজে নিয়োজিত হন। ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি‑ পর তিনি কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের কাজে যোগদান করেন। যাদবপুরে তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নি‍ে বিবেকনগর নামে একটি কলোনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং আদর্শ শিক্ষায়তন, আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি)

আর্যবিদ্যালয় (সহসভাপতি) প্রভৃতি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ১০ই জুন ১৯৯০ তারিখ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদনে বিকেল ৩-৪০ মিঃ পরলোক গমন করেন।

(ঠ) আমি সুভাষ বলছি—শৈলেশ দে

অখণ্ড সংস্করণ **বিশ্ববাণী প্রকাশনী**

কলিকাতা দ্বাদশ সংস্করণ ১৪০৭

পৃঃ ২৫৪-২৫৬

শুরু হল পাশাপাশি দুটি মামলা।

একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—অন্যটি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা, আসামির সংখ্যা মোট উনত্রিশজন। তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রতিরঞ্জন দাশ পুরকায়স্থ, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন সেন, **প্রফুল্লকুমার সেন**, পারুল মুখার্জী, শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী, প্রণবকুমার রায়, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, বিভূতি দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল এবং ধনেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

বলাবাহুল্য যে, কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না। রেহাই দেবার প্রশ্নই ওঠে না। হাতের মুঠিতে একবার যখন পাওয়া গেছে তখন প্রতিহিংসা নেবাব এমন অপূর্ব সুযোগ যে সদাশয় সরকার হারাবেন না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সবাইকেই দণ্ডিত করা হল দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে।

লৌহকপাটের দ্বার খুলল প্রায় একযুগ বাদে, জীবন সায়াহ্নে এসে। তখন যুদ্ধ শেষ।

ইতিমধ্যে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। কত রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কত উত্থান-পতন কত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। কত আনন্দ-বেদনার টুকরো টুকরো ইতিহাস, ঘরছাড়া এই পথিকের দল তার স্বাদ থেকে একবারেই বঞ্চিত। পাষাণ কারার অন্তরালে দিন আর রাত্রির যে একই চেহারা।

(ভ) Terrorism in Bengal
A Collection of Documents
Volume II
Compiled and Edited
by
Amiya K. Samanta
Director
Intelligence Branch
Government of West Bengal
Calcutta
1995

A Brief History
of The
Tippera Anushilan Samiti
(1928 to April 1938)
Compiled by
S. I. Gopal Chakrabartti
of the Tippera D.I.B.

The district of Tippera has always been in the forefront of every form of anti-British movement. Starting from the Anti-partition agitation and the Swadeshi movement which were the forerunners of the Maniktala Bomb case in which Ullaskar Datta of Tippera played an important part, up to date, the youths of Tippera have always been found taking part in every subversive movement. The tide of the Anushilan samiti started by Pulin Das of Dacca had its usual sways in Tippera.....

Activities of the other parties and their influences :

The part played by their hero Jogesh Chatarji in the Kakori Mail Dacoity which took place on the 9th August 1925 had already captured the imagination of the Anushilan enthusiasts of Tippera. Pratul Ganguli of Dacca visited the district several times and encouraged the workers....

The Tripura Hitashadhini Sabha which claims to be a social service organisation paid for the training of Prafulla Sen (later convicted in the Tittagarh Conspiracy Case) and sent him to the district on a monthly salary of Rs. 50 to carry on social

service propaganda. He utilised the opportunity for disseminating anti-Government ideas in youths and carried on a propaganda on behalf of the Youth and the Student movement, in short for the Anushilan party. This is how we began the year 1930....

The notorious terrorist and ex-State prisoner Trailokhya Chakrabartti alias Kalicharan alias Maharaja who hails from Kapasatia, police-station Bajitpur, Mymensingh (of the Fatejungpur murder notoriety) also visited Tippera and established a link with the Anushilan party of Faridpur which in subsequent days developed to a great extent, so much so that the headquarters of the party was shifted in 1934 from Tippera to Faridpur.

Inter-District Connections :

During the year under report (1930) we find that the Tippera Anushilan had established an inter-district link with the following districts :....

The Tippera Anushilan Samiti is nothing but a branch of the Dacca Anushilan Samiti of Pulin Das. Old members like Trailokhya Chakrabartti and Pratul Ganguli and Ramesh Acharji organised in Tippera. Monoranjan Ray of Bakshibazar, Dacca, Rabindra Chakrabartti of Dacca and another youth of Dacca came to Comilla as tourists on 30th April 1929, resided with Dhurjati Nag and were entertained by the Students' Association with a show of physical feats. Atindra Ray Chaudhuri had also visited Dacca and it is believed that the Dacca Anushilan was very closely linked up with the Tippera Anushilan.

Arrest of Probhat Chakrabartti :

The Bengal Ordinance was promulgated on the 19th April 1930 and Probhat Chakrabartti (ex-detenu) was arrested on the 22nd April 1930. (This dangerous terrorist absconded from his domicile at Asansol on the 10th January 1932, was subsequently arrested with firearms on the 14th January 1933 and convicted in the Inter-Provincial Conspiracy Case later.

Materials on record against others were not considered adequate to justify their detenution. Military drill with lathi (accompanied by hand), lathi and dagger play, meetings, conferences and

discussions continued unabated throughout the year 1930. The year had begun with a deliberate act of student incendiarism. On Independence Day (26th January 1930) the Comilla Station Club (European Club) premises were set fire to and reduced to ashes. Dhurjati Nag of Iswar Pathsala toured in Nabinagar and Brahmanbaria with his party, and Suresh Ganguli did the same in Chandpur. **The most popular subject for the lantern lecture of Prafulla Sen at that time was Biplabi Bangla.** Students' Day was organised on the 9th February 1930.

Centres and important workers :

(i) Comilla : This centres, originally organised by Atindra Ray Chaudhuri, Manindra Chakrabartti, Amulya Mukharji, Jogesh Chakrabartti and lesser leaders, continued its activity. Jagatbandhu Chakrabartti of Shaitshola, Burichang, was a very important member and he used to receive directions from Probhat Chakrabartti of Bordia.... Leading workers who used to assist Jagatbandhu were : (1) Ananta De of De Datta and Co. (2) Khagendra Dhar. (3) Promode alias Makhan Das. (4) Bhupendra Sarkar. (5) Kumud Sen. (6) **Prafulla Sen (Tittagarh Case) an important organiser having connection with the central body.** (7) Prafulla Nandi. (8) Hari Kumar Ray Chaudhuri of Chandpur. He was a very important member and a District leader of the Anushilan.

Arrests and action taken :

During the year 1932, as many as 50 arrests had to be made under the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1930....

Raids were organised now and then and the District Intelligence Branch staff had to be increased in order to cope with the increased volume of work. At the close of the year, the situation did not show any marked change for the better, as the organisation was very deep-rooted and its ramifications extended all over the district. **The notorious absconders Probhat Chakrabartti, Jagatbandhu Chakrabartti, Prafulla Sen were all out making mischief all over the place.** But the nature of intelligence secured showed a marked change and more useful agents were secured. The District Intelligence Branch organisation was also decentralized and two District Intelligence Officers were posted to the two subdivisions

in order to keep themselves more in touch with the local situation. This has indeed worked very well.

Inter-provincial connections and inter-district connections :

We have already indicated the inter-provincial connection of Probhat Chakrabartti's gang with the united Provinces, the Punjab and Madras....

Profulla Sen, Parul Mukharji and others were moving in Tippera, Faridpur and Barisal under different names and organising there....

History up to April 1934 :

In the following paragraphs (41 and 42) are quoted the history of the Anushilan party from an appreciation prepared by Rai Sahib Prabhat Ranjan Biswas of the Intelligence Branch, Calcutta.

Total strength of membership 475.

The policy of the Tippera Anushilan was to (i) recruit members for an armed mass rising, (ii) collect funds by stealing ornaments and cash and by committing dacoities to secure firearms, and (iii) murder of both European and Indian officials.

The party received a rude shock in the arrest of its leader Hari Kumar Ray Chaudhuri, and Ajit Sen and Anil Mukharji of Dacca at Hamankordi on the 8th April 1934. The following important workers of the party were also arrested during the year :

(i) Nalini Ranjan Das Gupta who escaped from externment in Rikhia in Deoghar. Arrested in Agartala on the 27th April 1934.

(2) Sachindra Mazumdar, Agartala leader.

(3) Ganesh Chakrabartti of Agartala.

(4) Ashit Bhattacahrji of Agartala.

(5) Sarat Nath of Comilla.

(6) Sailesh alias Biswa of Comilla.

(7) Jnan Banarji of Comilla.

(8) Miss Moyna alias Usha Mukharji of Comilla.

The party was particularly strong at Comilla, Chandpur, Brahmanbaria and Tripura State. Deba Prasad Sen Gupta, Ajit Ray, Prafulla Sen and Parul Mukharji were still absconding. Atul Datta of Chandpur was the district leader. He was arrested in Khulna in 1934.

Hajiganj mail dacoity with murder :

The Central Body was in desperate need of funds and absconder Deba Prasad Sen Gupta (since arrested on the 30th December 1934 in a den at Belgharia, 24 Parganas), arranged the looting of mails at Hajiganj which took place on the 2nd June 1934.....

Prafulla Sen and Deba Prasad Sen (both absconders at that time) received the bulk of the loot, and used it for the purpose of arranging the escape of and shelters for the Inter-Provincial Case criminals. This Mail dacoity with murder was the last and the most daring political crime in this district up to date.

The Organisation in Tippera district :—

The central body had deputed Sukumar Chakrabartti to take charge of the Tippera Anushilan in June 1934, but he was arrested as soon as he set his foot at Ramkrishnapur in Homna police-station from Faridpur district and eventually convicted under section 109, Criminal Procedure Code. Thus Tippera got detached from the Central Body for the time being, but the district did not lack in its representation in the Central Body, which according to secret information was shifted to Barisal towards the end of 1934 and thence to the vicinity of Calcutta. In December 1934 and January 1935, notorious absconders Purnanda Das Gupta (who had escaped from the Alipore Central Jail) and Miss Parul Mukharji of Tippera were arrested with ciphers and firearms in a den at Tittagarh on the 20th January 1935, Deba Prasad Sen of Agartala and Faridpur at Belgharia, on the 30th December 1934, following an explosion and **Prafulla Sen of Tippera at Sukchar, police-station Khardah,** on the 16th January 1935, all in the district of 24 parganas. These arrests followed by many more gave a death blow to the Central Body which could not manage to send any more district leaders to Tippera, but this district continued to have small groups at the places mentioned in this history previously and these were led by minor leaders who made occasional attempts to get connected with the Central Body.

(ঢ) Terrorism in Bengal

A Chronological Account of Violent Incidents from 1907 to 1939

Volume VI

Compiled and Edited

by

Amiya K. Samanta

Director

Intelligence Branch

Government of West Bengal

Calcutta

1995

The Anushilan Revolted Group was concerned in this case. (File 1244/35).

Serial No. : 831

Yearly No. : 13

Date : 20th January 1935

Place : Goalpara, police-station Tittagarh.

District : 24 Parganas.

Nature of crime : **recovery of arms and Tittagarh conspiracy Case.**

Remarks : While undergoing trial in the Inter-provincial Conspiracy Case (since disposed of) Purnananda Das Gupta, Niranjan Ghoshal and Sita Nath De escaped from the Alipore Central Jail on the 31st July 1934 **and the following were evading arrest under the Bengal Criminal Law Amendment Act from the dates mentioned against their names :—**

(1) Miss Parul Mukharji of Comilla-April 1932.

(2) **Prafulla Sen, of Tippera-2nd August 1934.**

(3) Deba Prasad Sen Gupta, of Faridpur and Agartalla-April 1932.

The police were on the look out for the abovementioned absconders..........

On the 16th January 1935 while investigation was going on regarding arrest of these persons, the Village Defence Party of Panihati, Sukchar, police-station Khardah, district 24-Parganas,

arrested Prafulla Sen mentioned above at the Sukchar football ground. There was another youth with Prafulla Sen who slipped away. Six suspicious letters in Bengali within a cover, addressed to "Basanta Kumar Datta," Timber Merchant, Adhuna, district Barisal, were found with him. Although he gave his full name and address, he offered no explanation regarding the letters found with him. According to the handwriting expert, all these letters were in the handwriting of Prafulla Sen.

Four days later (20th January 1935) a house at Goalapara in Tittagarh police-station, which is about 7 miles from the place where Prafulla Sen was arrested, was searched on the information contained in an anonymous letter. While the house was surrounded by the police, two persons climbed to the roof of the house and one of them threw away a loaded pistol which was subsequently picked up. While trying to escape, they were overpowered and arrested. One of them gave his name as "Pranab Ray of India" and the other refused to disclose his identity. They were subsequently identified as Shyam Binode Pal Chaudhury of Dacca and Purnananda Das Gupta of Dacca, respectively. The door of the room was locked from inside. When the search party threatened to use force, the occupant, who was subsequently identified as Miss Parul Mukharji noted above, opened the door. The house was searched and amongst other things the following were found :—

(1) A large quantity of chemicals used for the preparation of explosives and smoke clouds.

(2) Diagram of bombs.

(3) Typed sheets of paper containing instructions for the preparation of explosives.

(4) One "Where is it" note-book containing various names.

(5) Some loose sheets of paper containing names and addresses as also some burnt papers.

(6) Cryptic letters.

(7) List of books on explosives.

(8) Cryptic writings.

(9) Materials for disguise.

Following the arrest in these three different places and the finds therein, vigorous investigation proceeded and several more arrests were made and incriminating documents were discovered. In the papers seized at Belgharia, Titagarh and with Prafulla Sen, about 400 names with or without surnames and several addresses of persons mostly of Bengal and some of Bihar and United Provinces were mentioned and several of whom have been traced. As investigation proceeded, the revolutionary connection of Bijoy Pal Chaudhuri of Faridpur, who was a student in the Scottish Churches College, Calcutta, with Shyam Binode Pal Chaudhury came to light and Bijoy Pal Chaudhury was arrested at Faridpur. He made a judicial confession in which he spoke about his revolutionary connection with Shyam Binode Pal Chaudhury, Dhanesh Bhattacharji and others. The names of some of the persons mentioned by Bijoy Pal Chaudhury in his confession appeared in the Tittagarh papers. He further spoke of a revolver going off accidentally at 14, Guru Prasad Chaudhury Lane, in August 1934, while it was being handled. Shyam Binode Pal Chaudhury, who was living at this place, left it abruptly after the accident.

In the Tittagarh papers appeared "Santosh of Bar". "Bar" evidently stands for Barisal. Santosh Kumar Sen of Faridpur was arrested at Barisal on the 23rd January 1935. He made a judicial cofession which revealed a widespread conspiracy extending over different districts of Bengal, mainly Barisal and Faridpur and the sister province of Assam and other places. **According to him Prafulla Sen was the principal brain working for the secret organisation during the period when Provat Chakrabartty and other leaders were confined in jail in connection with the Inter-Provincial Conspiracy Case. He spoke of the Hajiganj (Tippera) dacoity as an overt act of the conspiracy. Part of its booty was spent for the defence of the Inter-Provincial Conspiracy Case and a part was spent for purchase of arms. Santosh Sen said that Prafulla Sen held meetings in different places in Barisal and Faridpur districts, when the programme of the party was chalked out.** He said that the party had several revolvers and pistols and he identified the Savage automatic pistol which was

recovered at Tittagarh as identical with the one he had preciously seen. **On Prafulla Sen's advice,** he had come to Belgharia with absconder Sita Nath De and met Purnananda Das Gupta, Niranjan Ghoshal and others there, and a secret meeting of the party was held there on the night of the 28th December 1934 at which the further programme of the party was discussed. Sufficient corroboration in respect of material particulars of Santosh Sen's confession was obtained and there was a magisterial verification of his confession.

Santosh Sen in his confession also stated that **Prafulla Sen** and another youth named Sudhangsu Bimal Dutta went to the house of Bijoy Gopal Bose at Rajpat, district Khulna, during his absence and kept a bundle with Bijoy's wife, Charu Bala Bose (mentuioned as Kakima of the party in whose house at **Barisal Prafulla Sen had kept Miss Parul Mukharji for some time),** which was subsequently taken back by Sudhangsu Bimal Dutta. This bundle was said to contain a breech-loading gun. Sudhangsu was connected with the den at Risra. His connection with Makhan Kar and Jagadish Ghattak also came to light. Sudhangsu was arrested in the Carmichael Medical College Hospital where he was admitted for treatment. It further came to light that the conspirators managed to engage shelters at various secluded places at Bhatpara, Belgharia, Risra, Bally, Tittagarh, Kidderpore, Kharda, Uttadaya and Sovabazar. Investigation also disclosed that these conspirators had important meeting places in the districts of Barisal and Faridpur. **It is evident that Prafulla Sen was organising the party during the period when Purnananda Das Gupta was confined in jail.**

The recovery of arms, ciphers, letters of Haren Munshi, letters found with **Prafulla Sen**, incriminating documents, different statements and confessions, evidence of suspicious associations at different places, led to the conclusion that there was a widespread conspiracy to wage war and to deprive His Majesty the King of the Sovereignty of British India as contemplated in section 121A, Indian Penal Code.

Accordingly the following 31 persons were placed on trial before a Special Tribunal and trial commenced on the 16th November

1935 when Sita Nath De was absconding. (He was subsequently arrested at Tippera in May 1936). Of these accused persons (30) Santosh Sen and (31) Bijoy Krishna Pal Choudhury turned approvers and they were tendered pardon. **Of the remaining 29 persons, 12 were acquitted and 17 convicted on the 27th April 1937 under section 121A, Indian Penal Code, and sentenced to various terms of imprisonment as shown against each :—**

(1) Purnananda Das Gupta—Transportation for life. He was also convicted under the Explosive Substances Act but no separate sentence was passed.

(2) **Prafulla Kumar Sen—Transportation for 12 years.**

(3) Shyam Binode Pal Choudhury—Rigorous imprisonment for 10 years. He was also convicted under Explosive Substances Act but no separate sentence was passed.

(4) Deb Prasad Sen—8 years rigorous imprisonment.

(5) Niranjan Ghoshal—7 years rigorous imprisonment.

(6) Santi Ranjan Sen—5 years rigorous imprisonment.

(7) Harendra Nath Munshi—5 years rigorous imprisonment.

(8) Kartic Senapati—5 years rigorous imprisonment.

(9) Jiban Krishna Dhupi—5 years rigorous imprisonment.

(10) Jagadish Ghatak—5 years rigorous imprisonment.

(11) Dhirendra Mukherji—5 years rigorous imprisonment.

(12) Deba Prasad Banerji—4 years rigorous imprisonment.

(13) Jagadish Ghatak—4 years rigorous imprisonment.

(14) Priti Ranjan Das Purakayestha—3 years rigorous imprisonment.

(15) Miss Parul Mukharji—3 years rigorous imprisonment.

(16) Bibhuti Bhattacharji—3 years rigorous imprisonment.

(17) Sudhangsu Bimal Dutta—3 years rigorous imprisonment in Borstal Jail.

(18) Rabindra Ghosh—Acquitted.

(19) Juran Ganguli—Acquitted.

(20) Deba Brata Roy—Acquitted.

(21) Jagneswar De—Acquitted.

(22) Jiban Krishna De—Acquitted.

(23) Makhan Kar—Acquitted.

(24) Dhiren Dhar—Acquitted.
(25) Biren Bose—Acquitted.
(26) Kalipada Bhattacharji—Acquitted.
(27) Sita Nath De—Acquitted.
(28) Ajit Majumdar—Acquitted.
(29) Dhanesh Bhattacharji—Acquitted.

The appeals of all 16 convicted accused (Harendra Munshi having died in jail during the disposal of the appeal) were dismissed by the Hon'ble High Court on the 9th May 1938.